'আমি 7 Habits নিয়ে যে বইটি লিখেছিলাম, আমার ছেলে শন বিনোদনের ভঙ্গিতে টিনেজারদের সঙ্গে তার এ বইতে সরাসরি কথা বলেছে। আমার ধারণা এ বইটি খুবই হিট করবে। আ মাস্ট রিড।'

স্টিফেন আর কোভি, The 7 Habits of Highly Effective People-এর লেখক।

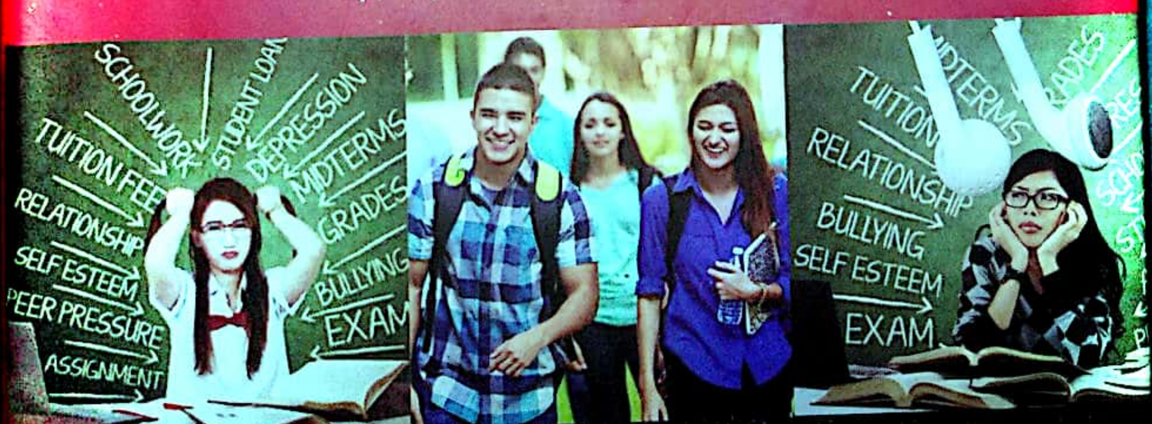
নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার

দ্য 7 হ্যাবিটস অব হাইলি ইফেকটিভ টিনেজার্স

কিশোর-কিশোরীদের জীবনমান বদলে দেওয়া ৭টি কার্যকরি অভ্যাস

শন কোভি

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু



দ্য সেভেন হ্যাবিটস্ অব হাইলি ইফেকটিভ টিনেজার্স

কিশোর-কিশোরীদের জীবন বদলে দেয়া ৭টি কার্যকরি অভ্যাস

শন কোভি

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

মুক্তদেশ
মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন

বইটি সম্পর্কে পাঠক-লেখক-সমালোচকদের মন্তব্য

চমৎকার! আমি এ পর্যন্ত যত বই পড়েছি তার মধ্যে সর্বসেরা বই হলো এটি। আমার কিশোর মস্তিষ্ককে মজবুত করেছে বইখানা। এটি সেরকম বই নয় যে পড়া শেষ করে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এটি সেই বই, যা বারবার পড়ার মতো এবং যতবার বইটি পড়বেন ততবার মনে হবে শেষেরবার কী যেন মিস করে গেছেন। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগে এ বইটি আপনাকে সাহায্য করবে এবং তাদের ও আপনার ভুলগুলো দেখবে ভিন্ন চোখে।'

—হেরিফোর্ডের জনৈক পাঠক, বয়স ১৪

দ্য বেস্ট! আমি একজন টিনেজার এবং সম্প্রতি বইটি পড়েছি। এটি এখন আমার কাছে দ্বিতীয় বাইবেলে পরিণত হয়েছে। মাস দুই আগে বইটি আমার হাতে আসে এবং ইতিমধ্যে অনেকবার এটি পড়ে ফেলেছি। বইটি খুব সহজপাঠ্য এবং বারবার পড়ার মতো। বইটি পড়ুন... কথা দিচ্ছি ভালো লাগবে। বিঃদ্রঃ এটি শুধু টিনেজারদের জন্য নয়, আমার মা পড়েও মজা পেয়েছেন।

—লন্ডনের একজন পাঠক

'এটি একটি অপূর্ব বই। বইটি আমার এতোই ভালো লেগেছে যে, আমার এক বন্ধুর জন্মদিনে এটি তাকে উপহার দিয়েছি। প্রতিটি টিনেজারের বইটি পড়া উচিত'।

—ব্যাসিংস্টোকের জনৈক পাঠক, বয়স ১৭

'আমি বইটি কিনেছিলাম আমার মেয়ের জন্য—এখন এটি তার সবচেয়ে প্রিয় বইতে পরিণত হয়েছে এবং সে তার বন্ধুদেরকেও পড়ে শোনাচ্ছে।'

—ওয়ার উইকশায়ারের জনৈক পাঠক

'আমাকে মুগ্ধ করেছে বইখানা। মনে হয়েছে যেসব দরজা এতোদিন আমার কাছে বন্ধ ছিল তা যেন ভেঙ্গে গেল... অসাধারণ একখানা গ্রন্থ।'

—লিডসের জনৈক পাঠক, বয়স ১৫

'অসামান্য! একজন শিক্ষক হিসেবে বলবো একটি দুর্দান্ত বই। বইটি শিক্ষক কিংবা টিনেজার যে কারও জন্য ক্রয় করা যায়। আমি বইটি আমার ক্লাসরুমে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছি।'

—এসেক্সের পাঠক

'শন কোভির the 7 Habits of Highly Effective Teenagers' 'টিনেজ আত্মা'র জন্য একটি প্রকৃত উপহার। আপনাকে চ্যালেঞ্জ জিততে আশা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং শক্তি জোগাবে।'

—জ্যাক ক্যানফিল্ড এবং কিম্বারলি কারবার্গার
Chicken Soup for Teenager Soul-এর লেখকদ্বয়

'আমি 7 Habits নিয়ে যে বইটি লিখেছিলাম, আমার ছেলে শন বিনোদনের ভঙ্গিতে টিনেজারদের সঙ্গে তার এ বইতে সরাসরি কথা বলেছে। আমার ধারণা এ বইটি খুবই হিট করবে। আ মাস্ট রিড।'

—স্টিফেন আর কোভি,
The 7 Habits of Highly Effective People-এর লেখক।

'জীবনে কিছু ঘটাতে গেলে সেরা উপায় হলো, টিনেজার হিসেবে সঠিক বাছাই বা নির্বাচন। the 7 Habits of Highly Effective Teenagers-এ কিশোর-কিশোরীরা তাদের জীবনের মূল শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে দেখতে পায়।'

—স্টেডম্যান গ্রাহাম, You can make it hapeen গ্রন্থের লেখক

'এ বইটিতে প্রচুর ইতিবাচক, প্রেরণাদায়ক এবং মোটিভেশন কৌশলের কথা বলা হয়েছে, যা টিনেজারদের সম্ভাবনা নিয়ে তাদেরকে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।'

—লরা সি. শ্লেসিঙ্গার।
Ten Stupid things women do
to messup their lives-গ্রন্থের প্রণেতা।

সূচিপত্র

অভ্যাস-৭ করাতটাকে ধারালো করো

আমি কে?

আমি তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আমি তোমার সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী অথবা সবচেয়ে ভারী বোঝা। আমি তোমাকে হয় সামনে ঠেলে দেবো নতুবা টেনে নিচে ব্যর্থতার মাঝে নামিয়ে আনবো। আমি পুরোপুরি তোমার নির্দেশে চলি। তুমি যা করো, তার অর্ধেক আমার ওপর চাপিয়ে দাও এবং আমি সেই কাজগুলো দ্রুত এবং সঠিকভাবে করে দেবো।

আমাকে খুব সহজে ম্যানেজ করা যায়, তবে আমার সঙ্গে তোমার মাঝেমধ্যে কঠিন হতে হবে। আমাকে শুধু দেখিয়ে দাও, কী কাজ করতে হবে এবং অল্প কয়েকটি শিক্ষাদানের পরে আমি তা নিজেই করে দেবো।

আমি সকল ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য এবং আমি সকল ব্যর্থতাও বটে। যারা বড় হয়েছে, আমি তাদেরকে বড় করেছি। যারা ব্যর্থ হয়েছে, আমি তাদেরকে ব্যর্থ করেছি।

আমি কোনো যন্ত্র নই, যদিও আমি যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারি, সেই সঙ্গে আমার রয়েছে মানুষের মতো বুদ্ধি। তুমি আমাকে লাভের জন্য চালিত করতে পারো কিংবা ধ্বংসের জন্য—আমার জন্য সবই সমান।

আমাকে নাও, ট্রেনিং দাও তোমাকে, আমার সঙ্গে কঠিন হও, আমি পৃথিবী এনে দেবো তোমার পদতলে। আমার সঙ্গে লঘু হও, আমি তোমাকে ধ্বংস করে দেবো।

বলো, আমি কে?



আমি অভ্যাস

প্রথম খণ্ড

সেট-আপ

অভ্যাস করো

তোমাকে ওরা গড়ে তুলবে অথবা ভেঙে ফেলবে

দৃষ্টান্ত এবং নীতি

তুমি যা দেখো, তাই তুমি পাও

অভ্যাস করো
ওরা তোমাকে তৈরি করবে কিংবা ভেঙে ফেলবে

স্বাগতম! আমার নাম শন এবং আমি এ বইটি লিখেছি। জানি না বইটি তুমি কীভাবে জোগাড় করেছো। হয়তো তোমার মা তোমাকে দিয়েছেন, যাতে তুমি নিজেকে গড়ে তুলতে পারো কিংবা তুমি নিজের টাকা দিয়েই বইটি কিনেছো এর শিরোনামে তোমার চোখ আটকে গিয়েছিল বলে। যেভাবেই বইটি তোমার হাতে আসুক না কেন, আমি সত্যি খুশি যে তুমি এটি পেয়েছো। এখন তোমার দরকার বইটি পড়ে ফেলা।

অনেক কিশোর ছেলেমেয়েই বই পড়ে, তবে আমি তাদের মতো ছিলাম না। (আমি অবশ্য অনেক নোটবুক সামারি পড়েছি।) তো তোমরা যদি আমার মতো হও তাহলে হয়তো বইটি না পড়েই তাকে রেখে দেবে। তবে এমন কিছু করার আগে আমার কথাটি শোনো। তুমি যদি কথা দাও বইটি পড়বে, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এটিকে আমি অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত করবো। বইটি মজার করে তোমার জন্য এতে কার্টুন আছে, দারুন দারুন আইডিয়া রয়েছে, অসাধারণ সব কোটেশন বা উক্তি দিয়েছি এবং সারা বিশ্বের সত্যিকারের টিনএজারদের দুর্দান্ত সব গল্পও রেখেছি... এছাড়াও কিছু সারপ্রাইজ রয়েছে। তাহলে কি বইটি তুমি একবার পড়ে ফেলার চেষ্টা করবে?

ঠিক আছে? ঠিক আছে!

এখন বইতে ফিরে আসা যাক। এ বইটি রচিত হয়েছে আরেকটি বইয়ের ওপর ভিত্তি করে। আমার বাবা বহু বছর আগে '*দ্য সেভেন হ্যাবিটস অব হাইলি ইফেকটিভ পিপল*' নামে একখানা বই লিখেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে সেই বইটি সর্বকালের সেরা বেস্ট সেলারের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। এই বইয়ের সাফল্যের জন্য তিনি আমাকে এবং আমার ভাই-বোনদেরকে ক্রেডিট দিয়েছেন। তবে যাই হোক, তোমরা বুঝতেই পারছো আমরা ছিলাম তাঁর গিনিপিগ। তিনি আমাদের ওপর তাঁর সকল সাইকো এক্সপেরিমেন্টগুলো করতেন এবং সেজন্য আমার ভাই-বোনদের বড় বড় ইমোশনাল প্রবলেম হয়েছিল (আরে না, ঠাট্টা করলাম ভাইবোনরা, তবে সৌভাগ্যক্রমে আমি ওসব থেকে রেহাই পেয়ে যাই।)

তাহলে আমি এ বইটি কেন লিখলাম? কারণ টিনএজারদের জীবন আর

বেলার মাঠ নয়। বাইরে তাদের জন্য একটি জঙ্গল অপেক্ষা করছে। আমি যদি ঠিকঠাক কাজ করে থাকি, তাহলে এ বইটি তোমাদের জন্য কম্পাসের মতো কাজ করবে সঠিক নির্দেশনা দিতে। আমার বাবা তাঁর বইটি লিখেছিলেন বড়দের জন্য (মাঝে মাঝে বইটি তাই পড়তে বিরক্তিই লাগতো) কিন্তু আমি লিখেছি মূলত কিশোর বয়সীদের জন্য।

যদিও আমি এখন আর কিশোর নই, তবে কিশোর বয়সটির কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। বেশিরভাগ সময় আমাকে একটা ইমোশনাল রোলার কোস্টারে চাপতে হয়েছে। পেছন ফিরে তাকালে ভাবতে অবাকই লাগে যে, আমি টিকে গিয়েছিলাম। আমি কখনোই ভুলবো না, তেরো বছর বয়সে যখন নিকোল নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম সেই কথা। আমি আমার বন্ধু বেনকে বলেছিলাম, আমি নিকোলকে পছন্দ করি। (মেয়েদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে এমন ভয় লাগতো যে, দোভাষীর সাহায্য নিতে হতো আমাকে)। বেন তার মিশন শেষ করে আমাকে রিপোর্ট দেয়।

'হেই শন, আমি নিকোলকে বলেছি তুমি ওকে পছন্দ করো।'

'ও জবাবে কী বললো?' খিক খিক করে হাসি আমি।

বললো, 'ওওওহ, শন। ও তো মোটকু!'

হেসে ওঠে বেন। আমি একদম ভেঙে পড়ি। ইচ্ছে করছিল একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে যাই এবং আর কোনোদিন কোনো মেয়েকে পছন্দ করবো না। তবে সৌভাগ্যক্রমে আমার শরীরের হরমোন জিতে যায় এবং আমি মেয়েদেরকে আবারও পছন্দ করতে শুরু করি।

আমার ধারণা কিছু টিনএজার যাদের অভিজ্ঞতা আমার মতোই ছিল, তাদের সঙ্গে তোমাদেরও অনেক মিল আছে।

'কতো কাজ পড়ে আছে কিন্তু সময়ের বড্ড অভাব। আমাকে স্কুলে যেতে হবে, হোমওয়ার্ক করতে হবে, অন্যান্য কাজ, পার্টি এবং সবার ওপরে রয়েছে পরিবার। আমি শেষ হয়ে গেলাম, আমাকে বাঁচাও!'

'আমি নিজেকে নিয়ে কী করে সন্তুষ্ট হবো যখন কোনো কিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি না? যেদিকেই তাকাই দেখতে পাই, সবাই আমার চেয়ে স্মার্ট, সুন্দর কিংবা জনপ্রিয়। আমি মনে মনে ভাবি, 'আমি যদি ওর মতো চুল পেতাম, ওর মতো জামাকাপড় পরতে পেতাম, ওর ব্যক্তিত্ব, ওর বয়ফ্রেন্ড, সব যদি আমি পেতাম তাহলে আমি খুশি হতাম।'

'নিজেকে প্রায়ই মনে হয় জীবন যেন চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।'

'আমার পরিবারটাই বাজে। যদি বাবা মাকে ছাড়া থাকতে পারতাম তাহলে

জীবনটা উপভোগ্য হতো। ওরা সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঘ্যানঘ্যান করেই যাচ্ছেন, মনে হয় না কোনোদিন তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবো।'

'জানি যেভাবে উচিত সেভাবে আমি জীবন যাপন করছি না। আমি নেশা করি, মদ খাই, সেক্স করি কী না করি? তবে যখন বন্ধুদের সঙ্গে থাকি তখন আমি এসব বাদ দিয়ে অন্য সবাই যা করে, আমিও তাই করি।'

'আমি আরেকটি ডায়েটিং শুরু করেছিলাম। এটি এ বছরের প্রথম প্রয়াস। আমি সত্যি বদলে যেতে চাই, তবে নিষ্ঠার সাথে এর সঙ্গে লেগে থাকতে পারি না। যখনই ডায়েট শুরু করি মনে অনেক আশা থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে আর ডায়েট করি না। তখন বড্ড বিশ্রী লাগে।'

'স্কুলে এ মুহূর্তে ভালো রেজাল্ট করতে পারছি না। ভালো গ্রেড না পেলে তো জীবনেও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবো না।'

'আমি খুব মুডি এবং প্রায়ই হতাশায় ভুগি। জানি না কী করবো।'

ওই সমস্যাগুলো বাস্তব আর তুমি বাস্তব জীবনকে এড়িয়ে যেতে পারো না। আমিও সে চেষ্টা করবো না। বরং তোমাকে কিছু পরামর্শ দেবো, যা বাস্তব জীবনে তোমার কাজে লাগবে। কী সেগুলো? টিনএজার বা তোমাদের জন্য সাতটি অভ্যাসের কথা বলবো, যে বৈশিষ্টগুলো বিশ্বজুড়ে সুখী এবং সফল টিনএজাররা ধারণ করে আছে।

তোমরা হয়তো ভাবছো এগুলো কী? তোমাদেরকে আর রহস্যের মধ্যে না রেখে বলেই দিচ্ছি। নিচে খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো এগুলো সম্পর্কে:

অভ্যাস ১ : **প্রোঅ্যাকটিভ হও।**
তোমার জীবনের দায়িত্ব নাও।

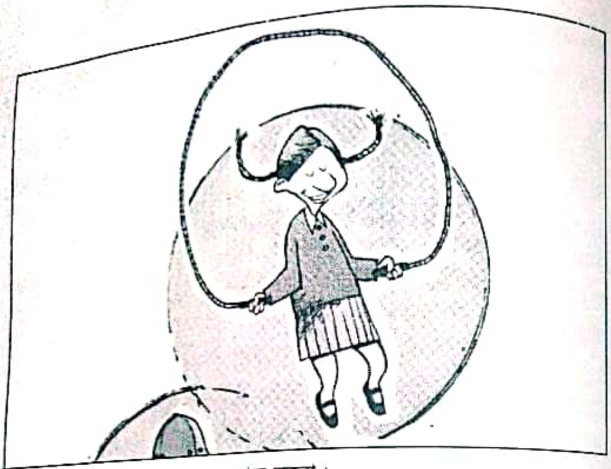
অভ্যাস ২ : **শেষটা দিয়ে শুরু করো।**
জীবনের জন্য তোমার মিশন এবং লক্ষ্য স্থির করো।

অভ্যাস ৩ : **আগের কাজ আগে করো।**
সবচেয়ে জরুরি কাজগুলো আগে করো।

অভ্যাস ৪ : **জেতার চিন্তা করো**
সবসময় জেতার চিন্তা করবে।

অভ্যাস ৫ : **আগে বুঝবার চেষ্টা করো, তারপর নিজেকে অন্যদের কাছে সেভাবে তুলে ধরো।**
লোকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো।

অভ্যাস ৬ : **ঐকতান**



আরও কিছু অর্জন করতে একসঙ্গে কাজ করো।

অভ্যাস ৭ : **করাত ধারালো করো।**

নিজেকে প্রতিদিন নতুনের মতো করো।

সেভেন হ্যাবিটস অব হাইলি ডিফেক্টিভ টিনেজার্স

অভ্যাস ১ : প্রতিক্রিয়া

যারা হাইলি ডিফেক্টিভ টিনএজার তারা সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে চাও তোমার বাবা-মা, শিক্ষক, পরশী, তোমাদের বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড, সরকার কিংবা অন্য কারও ওপর। তোমরা ভিক্টিম হও। জীবনের কোনো দায়িত্ব নিতে চাও না। জন্তু-জানোয়ারের মতো হয়ে ওঠে তোমাদের আচরণ। ক্ষিদে পেলে গবগব করে খেতে থাকো। কেউ চিৎকার করলে পাল্টা চেঁচামেচি করো।

অভ্যাস ২ : মনে কোনো ভাবনা থাকে না

ডিফেক্টিভ টিনএজারদের কোনো পরিকল্পনা থাকে না। যে কোনো উপায়ে লক্ষ্যে এগিয়ে যাও। কখনো আগামীকালের কথা ভাবো না। তোমার কাজের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে কেন ভাবছো? বর্তমান মুহূর্তের জন্য বাঁচো। ঘুরে বেড়াও, ঘুমাও, পার্টি করো, কারণ আগামীকাল তো আমরা মরেও যেতে পারি।

অভ্যাস ৩ : আগের কাজ পরে

তোমরা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে জরুরি কাজগুলো ঠিকঠাক মতো কখনোই করো না, ফোন এবং আড্ডাবাজিতে সময় কাটাও, ইন্টারনেটে ব্যস্ত থাকো।

হোমওয়ার্ক সবসময় পরের দিনের জন্য তুলে রাখো। অর্থাৎ আগের কাজটা করো সবার পরে।

অভ্যাস ৪ : জেতা এবং হারার কথা ভাবো

তোমরা জীবনকে দুটি প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখো। তোমার ক্লাসমেট তোমার পেছনে লেগেছে, তো তুমি দ্বিগুণ উৎসাহে তার পেছনে লেগে যাও। কাউকে সফল হতে দিতে চাও না, কারণ তুমি ভাবছো, সে সফল বলে তুমি হেরে যাবে।

অভ্যাস ৫ : কথা বলতে চাও আগে তবে পরে শোনার ভান করো

তুমি জন্মেছো একটি মুখ নিয়ে, কাজেই এটির ব্যবহার তো করতেই হবে। তুমি প্রচুর কথা বলো। যখন তোমার কথা সবাই শোনে, তারপর তুমি অন্যদের কথা শোনার ভান করো মাত্র।

অভ্যাস ৬ : সহযোগিতা করো না

তুমি অন্যদেরকে অদ্ভুত ভাবো তাই পাত্তা দিতে চাও না। ভাবো একসঙ্গে মিলে কাজ করে কুকুরের দল। যেহেতু তুমি ভাবো সবচেয়ে ভালো আইডিয়াটি তুমিই বের করেছো, কাজেই নিজেই সব করতে চাও।

অভ্যাস ৭ : নিজেকে ক্লান্ত করে তোলো

জীবন নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকো যে, নিজের উন্নতি করা বা নতুনভাবে গড়ে তোলার সময়ই পাও না। তোমরা পড়াশোনা করো না। নতুন কিছু শেখো না। ভালো বই থেকে দূরে থাকো।

দেখতেই পাচ্ছো ওপরে যে অভ্যাসগুলোর কথা বলা হলো, তা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তবু এ অভ্যাসগুলো আমাদের অনেকেই অনুশীলন করে চলেছি। এ কারণেই জীবন মাঝে মাঝে বড্ড নিরস লাগে।

অভ্যাস আসলে কী?

অভ্যাস এমন জিনিস, যা আমরা নিয়মিত চর্চা করি। তবে বেশিরভাগ সময় এ চর্চার বিষয়ে সচেতন থাকি না। এগুলো অটোপাইলটের মতো আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিছু ভালো অভ্যাস রয়েছে, যেমন :

* নিয়মিত এক্সারসাইজ করা
* পরিকল্পনা করে রাখো
* অন্যদেরকে সম্মান প্রদর্শন

কিছু বদভ্যাস হলো :

* নেতিবাচক চিন্তা
* হীনমন্যতায় ভোগা
* অন্যদেরকে দোষারোপ

তবে অভ্যাসের চেয়ে তুমি অনেক বেশি শক্তিশালী, তাই এগুলো বদলাতে পারবে। তুমি আয়নায় তাকিয়ে বলতে পারো, 'হেই, আমার মধ্যে অমুক অমুক যে জিনিসগুলো রয়েছে তা আমার পছন্দ নয়।' তখন তুমি তোমার বদভ্যাসগুলো বাদ দিতে পারবে। কাজটি সবসময় সহজ না হলেও করা সম্ভব।

এ বইতে যেসব আইডিয়ার কথা বলা হয়েছে, সবই যে তোমার কাজে লাগবে এমন নয়। তবে ফলাফল পাবার জন্য তোমাকে যে একদম নিখুঁত হতে হবে এমনটিও নয়। কিছু অভ্যাসের সঙ্গে বসবাস মাঝে মাঝে তোমার জীবনের অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে বদলে দেবে, যা কখনো সম্ভব নয় বলেই তোমার মনে হয়েছে।

৭টি অভ্যাস যেভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারে:

* তোমার জীবনে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসবে।
* বন্ধুদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে।
* বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।
* বাবা-মা'র সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করবে।
* নেশা থেকে মুক্তি লাভ হবে।
* তোমার ভ্যালুজ সংজ্ঞায়িত করে জাগবে তোমার মন, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কোনটি।
* কম সময়ে কাজ সারতে সাহায্য করবে।
* আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
* সুখি করে তুলবে।
* ঘুম, কাজ, বন্ধু-বান্ধবসহ অন্য সবকিছুর সঙ্গে ভারসাম্য তৈরি করবে।

শেষ একটি কথা। বইটি তোমার জন্য লেখা। কাজেই এটি ব্যবহার করো। পেন্সিল, কলম কিংবা হাইলাইটার নিয়ে বসে যাও। দাগ দাও। আন্ডারলাইন করতে ভয় পেয়ো না। তোমার প্রিয় আইডিয়াগুলো হাইলাইট করো অথবা বৃত্ত এঁকে দাও। মার্জিনে নোট নাও। যে গল্পগুলো তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে সেগুলো আবার পড়ো। যেসব কোটেশন তোমাকে আশার বাণী শুনিয়েছে, সেগুলো স্মরণ করো।

তো আর কী? এখন বইটি নিয়ে বসে যাও।

প্যারাডাইম এবং নীতি

তুমি যা দেখবে, তুমি তাই পাবে

নিচে যে স্টেটমেন্টের তালিকা দেয়া হলো, তা বহু বছর আগে এ বিষয়ে এক্সপার্টরা বলে গেছেন। এক সময় বলা হতো এগুলো খুব বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য। পরে প্রমাণ হয় এসব নির্বোধের উক্তি।

সর্বকালের সেরা ১০ নির্বোধ উক্তি

১০. 'সবার বাড়িতে একটি করে কম্পিউটার থাকার কোনো মানেই হয় না।'
–কেনেথ ওলযেন, ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশনের সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৭৭

০৯. 'এরোপ্লেন চিত্তাকর্ষক খেলনা, তবে এগুলোর কোনো সাধারণ মূল্য নেই।'
–মার্শাল ফার্দিনান্দ ফচ, ফরাসী সামরিক কুশলবিদ এবং ভবিষ্যৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কমান্ডার, ১৯১১

০৮. 'বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক না কেন, মানুষ কোনোদিন চাঁদে পৌঁছাতে পারবে না।'
–ড. লিডি ফরেস্ট, অডিওন টিউবের আবিষ্কর্তা এবং রেডিওর জনক, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭

০৭. 'চালু হওয়ার ছয় মাস পরেই টেলিভিশন কোনো বাজার ধরে রাখতে পারবে না। লোকে প্রতিরাতে একটি প্লাইউডের বাক্সের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যাবে।'
–ডেরিল এফ. যানুক, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের প্রধান, ১৯৪৬

০৬. 'ওদের শব্দ আমাদের পছন্দ হয়নি। গিটারের গ্রুপের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'
–১৯৬২ সালে দ্য বিটলসকে প্রত্যাখ্যানের পরে ডেক্কা রেকর্ডস।

০৫. 'বেশিরভাগ মানুষের জন্য তামাক একটি মঙ্গলজনক প্রভাব রাখবে।'
–ড. আয়ান জি. ম্যাকডোনাল্ড, লস এঞ্জেলেস সার্জন, ১৯৬৯ সালের ১২ নভেম্বর নিউইয়র্ক পত্রিকায় এ মন্তব্য করেন।

০৪. 'এই টেলিফোন' যন্ত্রটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক ব্যর্থতার প্রমাণ দিচ্ছে। এটির আমাদের কাছে কোনো মূল্য নেই।'
–ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইন্টারড্যাল মেমো, ১৯৭৬

০৩. 'পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।'

-টলেমি, প্রখ্যাত মিশরীয় জ্যোতির্বিদ, দ্বিতীয় শতক।

০২. 'আজ গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ঘটেনি।'

-রাজা তৃতীয় জর্জ, ৫ জুলাই ১৭৭৬ (আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস)।

০১. 'যা আবিষ্কার হওয়ার সব আবিষ্কার হয়ে গেছে।'

-চার্লস এইচ ডুয়েল, ইউএস কমিশনার অব প্যাটেন্ট, ১৮৯৯।

এতোক্ষণ এ লেখাগুলো পড়লে। এবার তোমাদের মতো সত্যিকারে টিনএজাররা যেসব স্টেটমেন্ট করেছো, সেগুলোর একটি তালিকা এখানে দেয় যাক। এসব কথা হয়তো তোমরা আগেও শুনেছো এবং এগুলো আগে তালিকাটির মতোই হাস্যকর।

* 'আমার পরিবারের কেউ কোনোদিন ইউনিভার্সিটিতে যায়নি। আমি ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবো ভাবাটাই তো পাগলামী।'

* 'কোনো লাভ হবে না। আমার সৎ বাবার সঙ্গে আমার কোনোদিনই মিল হবে না। কারণ আমরা দু'জনে একদমই আলাদা।'

* 'স্মার্ট হওয়া মুখের কথা নয়।'

* 'ও দেখতে এতো সুন্দরী—বাজি, ও প্রচণ্ড অহংকারী।

* 'সঠিক মানুষটির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তুমি জীবনে সামনে এগোতে পারে না।'

* 'আমি? রোগা হয়ে গেছি? ঠাট্টা করছো? আমার গোটা পরিবার মোটা মানুষ বোঝাই!'

* এখানে চাকরি পাওয়া অসম্ভব, কারণ কেউ এ এলাকায় টিনেজারদেরকে কাজ দিতে চায় না।'

প্যারাডাইম কী জিনিস?

স্টেটমেন্টের যে দুটি তালিকা দেয়া হলো, তাতে মিল কোথায়? মিল আছে প্রথম মিল রয়েছে তাদের পারসেপশন বা উপলব্ধিতে। দ্বিতীয় মিলটি তাদের উক্তিগুলো সঠিক নয় কিংবা অসমাপ্ত। যদিও যারা এসব কথা বলেন, তাঁদের ধারণা তাঁরা ঠিক কথাটিই বলেছেন।

পারসেপশনের সমার্থক আরেকটি শব্দ হলো প্যারাডাইম। প্যারাডাইম হলো তুমি যা দেখছো, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, তুমি যা বিশ্বাস করছো ইত্যাদি। তার আভিধানিক একটি অর্থও আছে—দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ। মাঝেমধ্যে আমাদের দৃষ্টান্ত কিছু সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। যেমন, তোমার ধারণা তুমি কোনোদিন ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবে না। তবে ভুলে যেয়ো না, টলেমি কিন্তু বিশ্বাস করেছেন, পৃথিবীই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।



তারপর ধরো ওই কিশোরীটির কথা যে ভাবছে, তার সৎ বাপের সঙ্গে তার কোনোদিন মিল মহব্বত হবে না। এটা তার প্যারাডাইম, সে কি আদৌ কখনো মিল মহব্বতের চেষ্টা করেছে? সম্ভবত নয়, কারণ মনের ওই বিশ্বাসই তাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

প্যারাডাইম চশমার মতো। তুমি যদি জীবনে অসমাপ্ত দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ গ্রহণ করো সেটি হবে ভুল উপলব্ধির চশমা পরার মতো। ওই চশমার কাচ তুমি যা দেখতে চাইবে তাই দেখাবে। তুমি যদি মনে মনে নিজেকে বোকা ভাবো, তবে মনের বিশ্বাসই তোমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে। তুমি যদি মনে করো তোমার বোন একটি বোকা টাইপের মেয়ে, নিজের বিশ্বাসকে সমর্থন করতে তুমি প্রমাণ চাইবে, পেয়ে যাবে এবং সে তোমার চোখে বোকাই থাকবে। আবার নিজেকে স্মার্ট ভাবলে এ বিশ্বাস তোমাকে স্মার্ট করে তুলবে।

ক্রিস্টি নামে এক কিশোরী একবার আমাকে বলেছিল, সে পাহাড়-পর্বত খুব ভালোবাসে। একদিন সে তার চোখের ডাক্তারের কাছে গেল এবং বিস্ময় নিয়ে জানলো, তার চোখের অবস্থা খুবই খারাপ। নতুন চশমা নিল সে এবং নতুন একটা জগত খুলে গেল তার সামনে। যেসব জিনিস আগে খুঁটিয়ে দেখতো না, সেগুলোও চমৎকার দেখতে পেত। ব্যাপারটি এরকমই। আমরা আমাদের প্যারাডাইম গুলিয়ে ফেলি বলে বুঝতে পারি না, কতোকিছু মিস করছি অনবরত।

আমাদের নিজেদের ব্যাপারে, অন্য লোকদের ব্যাপারে এবং জীবন নিয়ে আমাদের দৃষ্টান্ত রয়েছে। একবার চোখ বুলানো যাক।

নিজের ব্যাপারে প্যারাডাইম/দৃষ্টান্ত

নিজেকে প্রশ্ন করো: তোমার নিজের প্যারাডাইম কি তোমাকে সাহায্য করছে নাকি তোমাকে পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

আমার স্ত্রী রেবেকা, তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্রী, একটি ট্যালেন্ট প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল। তবে তার ক্লাসমেট লিন্ডা প্রতিযোগিতায় নাম দিতে চাইছিল না।

'লিস্টে তোমার নাম লেখো, লিন্ডা,' বললো রেবেকা।

'না, আমি প্রতিযোগিতায় পারবো না।'

'আরে পারবে। অনেক মজা হবে দেখো।'

'না, আমি আসলে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার মতো মেয়ে নই।'

'অবশ্যই তুমি এ ধরনের মেয়ে। তুমি খুব ভালো করবে, দেখো!' বললো রেবেকা।

সে সহ অন্যরা লিন্ডাকে উৎসাহ যোগাতে লাগলো যাতে সে প্রতিযোগিতায় নাম দেয়।

এর সাত বছর পরের ঘটনা। লিন্ডার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল রেবেকা। তাতে সে প্রতিযোগিতায় নাম দেয়ার দিনটির কথা উল্লেখ করে লিখেছে, সেদিন তার মনের মধ্যে কতো দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছিল এবং রেবেকাকে ধন্যবাদ দিল তার ভেতরের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করার জন্য, যে আলো ওর জীবনটাই বদলে দেয়। লিন্ডা জানায়, স্কুলে সে তার সেলফ ইমেজ নিয়ে বড়ই শরমিন্দা থাকতো এবং ওই প্রতিযোগিতার জন্য রেবেকা তার নাম দিতে বললে সে রীতিমত চমকে গিয়েছিল। রেবেকাসহ অন্যদের জোরজুরি থেকে রেহাই পেতে অবশেষে সে তালিকায় নাম দিতে রাজি হয়।

লিন্ডা বলে, প্রতিযোগিতাটি নিয়ে সে এমন অস্বস্তিতে ছিল যে, প্রতিদিনই সংগঠকের কাছে গিয়ে তালিকা থেকে নিজের নামটি বাদ দিতে বলে। তবে রেবেকার মতো সংগঠকও বলে, লিন্ডা যেন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয় লিন্ডা।

তবে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সাহস দেখিয়ে লিন্ডা নিজের ভেতর নতুন একটি আলো দেখতে পায়। পরে সে রেবেকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে অন্তরের অন্তস্থল থেকে, তার চোখ থেকে বিকৃত চশমাটি খুলে ফেলে সেটা আছড়ে ভেঙে নতুন একটি চশমা পরার অনুরোধ করার জন্য।

ওই প্রতিযোগিতায় লিন্ডা যদিও কোনো পুরস্কার জিততে পারেনি, তবে মঞ্চ

একটি বাধা তার সামনে থেকে অপসারিত হয়ে যায়: নিজের সম্পর্কে নিচু ধারণা। আর তার উদাহরণ অনুসরণ করে তার ছোট দুই বোনও পরের বছরগুলোতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

পরের বছর লিন্ডা পারফেক্ট হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতার জন্য, সে হয়ে ওঠে প্রাণোচ্ছল এবং হাসিখুশি।

লিন্ডা যে অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে গিয়েছে তাকে বলে 'প্যারাডাইম শিফট।' এর অর্থ হলো, হঠাৎ করে সবকিছু তুমি নতুন চোখে দেখতে শুরু করবে, নতুন নতুন পথ খুলে যাবে তোমার সামনে, যেন একটি নতুন চশমা পরেছো চোখে।

নেতিবাচক সেলফ প্যারাডাইম/দৃষ্টান্ত আমাদের ওপর সীমাবদ্ধতা এনে দিতে পারে। ইতিবাচক সেলফ-প্যারাডাইম/দৃষ্টান্ত নিয়ে আসে আমাদের সেরাটা। উদাহরণ হিসেবে নিচের গল্পটি বলা যায়। এ গল্প ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠদশ লুই-এর।

রাজা লুইয়ের কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তাঁকে কারাবন্দি করা হয়। তার তরুণ যুবরাজ পুত্রকেও রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা বন্দি করে। তারা ভেবেছিল, রাজার ছেলে যেহেতু রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী কাজেই তাঁকে নৈতিকভাবে ধ্বংস করা না গেলে তিনি কখনও বুঝতে পারবেন না, নিয়তি তার জন্য কী নিয়ে এসেছে।

তারা যুবরাজকে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং নানাভাবে অত্যাচার করতে থাকে। দামী দামী খাবার খাওয়ার লোভ দেখাতো। সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে তারা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতো। তাঁকে অপমান এবং অসম্মান করতো। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে রাখতো। টানা ছয় মাস তাঁর সঙ্গে এরকম বিশ্রী আচরণ করা হয়। কিন্তু তরুণ যুবরাজ এক মুহূর্তের জন্যেও ভেঙে পড়েননি। শেষে তারা তাঁকে প্রশ্ন করে—তিনি কীভাবে মনোবল অটুট রেখেছেন। তাঁর কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য সুন্দরী নারীদেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু যুবরাজ তাদের দিকে ফিরেও তাকাননি। জবাবে তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে যেসব কাজ করতে বলেছিলে তা আমি করতে পারিনি। কারণ, এসব আমাকে মানায় না, আমার জন্মই হয়েছে রাজা হওয়ার জন্য এবং আমি রাজকীয় আচরণ করতেই অভ্যস্ত।'

যুবরাজ লুই নিজের দৃষ্টান্তের বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন বলে কোনোকিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি। আর বাস্তব জীবনে তুমি যদি বিশ্বাস করো, 'আমি এ কাজটি করতে পারবো' তাহলে নিশ্চয় পারবে।



এ পর্যায়ে তুমি ভাবতে পারো 'আমার নিজের দৃষ্টান্ত যদি দোমরানো মোচড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে আমি এটি ঠিক করবো কীভাবে?

এর একটি উপায় আছে। তুমি এমন করে সময় কাটাবে যে, তোমাকে বিশ্বাস করে, তোমার ওপর আস্থা রাখে এবং তোমাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আমার মা আমার জন্য এরকম একজন মানুষ ছিলেন। বড় হওয়ার সময় আমার ওপর সবসময় বিশ্বাস রাখতেন আমার মা। বিশেষ করে যখন নিজের ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে উঠতাম। তিনি সবসময় বলতেন, 'শন, তোমার অবশ্যই ক্লাস ক্যাপ্টেন হওয়া উচিত।' এবং ওকে অনুরোধ করো। আমি নিশ্চিত ও তোমার সঙ্গে বাইরে যেতে পছন্দ করবে।'

আমার যখনই মনে ইতিবাচক ধারণা জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন পড়তো, মা'র সঙ্গে কথা বলতাম এবং তিনি আমার চশমার কাচ পরিষ্কার করে দিতেন।

যে কোনো সফল মানুষকে জিজ্ঞেস করো, তিনি বলবেন তাঁর এমন কোনো সঙ্গী ছিলেন যিনি তাঁকে বিশ্বাস করতেন। সেই লোকটি হতে পারেন শিক্ষক, বন্ধু, বাবা-মা, কোনো গার্ডিয়ান, বোন, দাদীমা যে কোনো একজন লোক হলেই হলো, এবং তিনি কে তা মুখ্য নয়, এ লোকটিকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই এবং তার কাছ থেকে কিছু শিখতেও আপত্তি যেন না থাকে। এদের কাছে পরামর্শের জন্য যাও। তাঁরা তোমাকে যেভাবে দেখেন, সেভাবে নিজেকে দেখার চেষ্টা করো। নতুন চশমা পরলে সবকিছু কেমন বদলে যায়! একদা একজন বলেছিলেন, 'ঈশ্বর তোমাকে যা বানাতে চেয়েছেন সেটি যদি তুমি কল্পনা করতে

পারো, তাহলে তুমি উঠে দাঁড়াতে পারবে এবং আর আগের মতো থাকবে না।

মাঝে মাঝে সঙ্গী হিসেবে হয়তো কেউ জুটবে না। তখন একাই চলতে হবে পথ। এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে পরের অধ্যায়টি মনোযোগ সহকারে পাঠ করো। তোমার সেলফ-ইমেজ গড়ে তুলতে এটি সাহায্য করবে।

অন্যদের দৃষ্টান্ত

নিজেদের ব্যাপারেই শুধু আমাদের প্যারাডাইম/উদাহরণ নেই, অন্যদের বিষয়েও রয়েছে। বেকি আমাকে তার প্যারাডাইম/দৃষ্টান্ত শিফট সম্পর্কে গল্প বলেছে।

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় আমার একটি বন্ধু ছিল কিম নামে। খুব ভালো মানুষ ছিল। কিন্তু সময় যত বয়ে যেতে লাগলো ততই সে যেন কেমন বদলে যেতে থাকলো। একটুতেই সে অপমানিত বোধ করতো এবং রেগে যেত। ও হয়ে উঠেছিল মুডি এবং ওর সঙ্গে চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলে ওর সঙ্গে আমার এবং আমার বন্ধুদের ক্রমে একটি দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। একসময় আমরা তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিই।

ওই বছর গরমের ছুটি বাড়ি কাটিয়ে স্কুলে ফিরেছি, আমার এক ভালো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। সে আমাকে স্কুলের সমস্ত খবরাখবর দিচ্ছিলো। নানান গসিপ, কে কার সঙ্গে ডেট করছে ইত্যাদি। হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'আচ্ছা, তোমাকে কি কিমের কথা বলেছি? আজকাল খুব কঠিন সময় যাচ্ছে তার, কারণ ওর বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। তাই কিমের খুব মন খারাপ।'

এ কথা শোনার পরে কিমের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একদম বদলে যায়। ওর আচরণে বিরক্ত হওয়ার বদলে ওর জন্য আমার খুব মায়া হতে থাকে। মনে হয় ওর প্রয়োজনের সময় আমি ওকে ত্যাগ করেছি। শুধু ওই ছোট্ট একটি তথ্য জানার পরে কিমের প্রতি আমার সমস্ত অ্যাটিটিউডের পরিবর্তন ঘটে। এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি চোখ খুলে দেয়া অভিজ্ঞতা। আসলে আমরা অনেক সময়ই লোকের সম্পর্কে কিছু না জেনেই উল্টাপাল্টা ভেবে বসে থাকি।

জীবনের দৃষ্টান্ত

নিজেদের এবং অন্যাদের উদাহরণ ছাড়াও সাধারণভাবে পৃথিবীকে নিয়েও আমাদের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিজেকে প্রশ্ন করেই তুমি তোমার উদাহরণ সম্পর্কে জেনে নিতে পারো। আমার জীবনের চালিকা শক্তি কী?' 'আমি কী ভেবে আমার সময় কাটাই?' অথবা 'কে বা কী আমার অবসেশন?' তোমার কাছে

সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটিই হতে পারে তোমার দৃষ্টান্ত বা তোমার লাইফ সেন্টার। কিশোর-কিশোরীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইফ সেন্টার হতে পারে বন্ধু-বান্ধব, গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড, স্কুল, বাবা-মা, খেলাধুলা, শখ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিটির ভালো পয়েন্ট রয়েছে, তবে এগুলো এক বা অন্য কোনোভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে এবং আমি তোমাদেরকে সেটাই দেখাবো যে, যদি তোমরা তোমাদের জীবন এসবের ওপর পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত করো, তাহলে সব তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে।

বন্ধু-কেন্দ্রিক

একদল বন্ধু পাবার মতো মজাদার আর কিছু নয় এবং সবচেয়ে বাজে ব্যাপার যদি এক ঘরে থাকতে হয়। বন্ধুরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাই বলে কখনও বন্ধু-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ো না। কেন? কারণ মাঝেমধ্যেই তারা বদলে যায়, বন্ধুত্বের প্রতি অনুগত থাকে না। কখনও বা দেখা যায় তারা ভুয়া। মাঝেমধ্যে তারা আড়ালে তোমাকে নিয়ে সমালোচনা করে, অথবা নতুন কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে তোমার কথা ভুলে যায়। এদের মতিগতির বালাই নেই।

বিশ্বাস করো বা না-ই করো, এমন একটা দিন আসবে যখন বন্ধুরা তোমার জীবনের সবচেয়ে সেরা হিসেবে থাকবে না। স্কুল জীবনে আমার খুব ভালো একটি বন্ধুর দল ছিল। আমরা সবকিছুই একসঙ্গে করতাম। এদেরকে আমি খুব ভালোবাসতাম। মনে হতো এ দোস্তী কভু ভাঙবে না।

কিন্তু স্কুল ছেড়ে অন্য আরেক জায়গায় যাওয়ার পরে অবাক হয়ে লক্ষ করেছি, আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। আমরা দূরে থাকতাম, নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, নতুন চাকরি এবং পরিবারের পেছনে সময় ব্যয় ইত্যাদি আমাদের দিনগুলোকে কেড়ে নিচ্ছিল। কিশোর বয়সে এসব বিষয় বুঝতেই পারিনি।

যত ইচ্ছে বন্ধু গড়ে তোলো, তবে ওদেরকে কেন্দ্র করে নিজের জীবন গড়ে তুলো না, এটি একটি অস্থিতিশীল ভিত্তিমূল।

ভোগ্যপণ্যকেন্দ্রিক

মাঝে মাঝে আমরা পৃথিবীকে দেখি ভোগ্যপণ্যের চশমা দিয়ে। আমরা এমন একটি ম্যাটেরিয়াল জগতে বাস করি, যেখানে ভোগ্যপণ্যটাই আসল হয়ে উঠেছে। আমরা সবচেয়ে দ্রুতগামী গাড়ির মালিক হতে চাই, চাই সবচেয়ে সুন্দর পোশাক, লেটেস্ট স্টেরিও, সেরা হেয়ারস্টাইলসহ আরও অনেক কিছু, যা আমাদের জন্য এনে দেবে সুখ।

ভোগ্যপণ্য ভোগ করতে কোনো দোষ নেই। তবে আমাদের জীবন যেন ভোগ্যপণ্যকেন্দ্রিক হয়ে না ওঠে। শেষ পর্যন্ত এসবের কিন্তু কোনোই মূল্য থাকে না। আমাদের আত্মবিশ্বাস আসা উচিত ভেতর থেকে, বাইরের জিনিসপত্র দেখে না।

আমি একটি মেয়েকে চিনতাম, সে খুব সুন্দর সুন্দর এবং দামী জামাকাপড় পরে স্কুলে আসতো। খুব কমই তাকে একই জামা দু'বার পরতে দেখেছি। আমি তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি, তার সমস্ত আত্মবিশ্বাসের মূল ওই দামী দামী পোশাক। সে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বললে আপাদমস্তক খুঁটিতে দেখতো যে, তার মতো সুন্দর এবং দামী জামা পরেছে কিনা মেয়েটি। এর ফলে মেয়েটির মধ্যে একটি সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে। সে ছিল ভোগ্যপণ্য কেন্দ্রিক। এ কারণে এ মেয়েটিকে আমার মোটেও পছন্দ হতো না।

বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ডকেন্দ্রিক

কোনো ছেলে বা মেয়েই বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্দকেন্দ্রিক হয় না? ধরো, জেমসের জীবন তার গার্লফ্রেন্ড নাতাশাকেন্দ্রিক। এখন দেখা যাক নাতাশা জেমসের জীবনে কীরকম প্রভাব রাখছে।

নাতাশার কর্মকাণ্ড	জেমসের প্রতিক্রিয়া
১. একটা নিষ্ঠুর মন্তব্য করে বসলো	'আমার দিনটাই গেল মাটি হয়ে।'
২. জেমসের বেস্টফ্রেন্ডের সঙ্গে ফ্লার্ট করলো	'আমার সঙ্গে বিট্রে করেছে। আমি আমার বন্ধুকে ঘেন্না করি।
৩. আমার মনে হয় আমাদের অন্য কারও সঙ্গে ডেট করা উচিত	'আমার জীবন শেষ। তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না।'

মজার ব্যাপার এই যে, তুমি যতই একজনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে ততই ওই মানুষটি তোমার প্রতি আকর্ষণ হারাতে শুরু করবে। কীভাবে সেটা? প্রথমত, তুমি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠো, তাহলে তুমি অত্যন্ত সহজলভ্য হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, বিষয়টি খুবই বিরক্তিকর যে, একজন মানুষ তার গোটা ইমোশনাল লাইফ তোমাকে ঘিরে তৈরি করে রেখেছে। যেহেতু এদের নিরাপত্তার বিষয়টি তোমার কাছ থেকে আসছে, ওদের ভেতর থেকে নয়, কাজেই তারা তোমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

আমি যখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে ডেটিং করতাম, তখন যে বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করতো তা হলো, সে তার জীবন আমার ওপর চাপিয়ে দিতে

চাইতো না। একবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ডেটে সে যায়নি। স্রেফ হেসে এবং কোনোরকম ক্ষমা প্রার্থনা না করে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা দারুণ লেগেছিল। ও ছিল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান। নিজের কথা শুনে চলতো।

বিশ্বাস করো, তুমি ভালো বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ড হতে পারবে যদি তোমার পার্টনারকেন্দ্রিক না হও। কারও ওপর নির্ভর করার চেয়ে স্বাধীনভাবে চলা অনেক ভালো। তাছাড়া কারও ওপর খুব বেশি ঝুঁকে গেলে তার মানে এই নয় যে, তুমি তার প্রতি বেশি বেশি ভালোবাসা দেখাচ্ছো। আসলে তুমি তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছো।

যত ইচ্ছে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড বানাও, শুধু তাদেরকে নিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে না পড়লেই হলো। কারণ তারা যতই অন্যরকম হোক না কেন, সাধারণত এসব সম্পর্ক বেশিদিন টেকে না।

স্কুলকেন্দ্রিক

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায়, তাদের জীবন হয়ে পড়েছে স্কুলকেন্দ্রিক। স্কুল কেন্দ্রিক জীবন হওয়ার জন্য লিসার আফসোসের সীমা নেই। সে বলেছে :

আমি এতো বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং স্কুলকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিলাম যে, কিশোর জীবনটাকে উপভোগ করতেই পারিনি। এতে আমি অনেকটা স্বার্থপর হয়ে উঠি, কারণ সারাক্ষণ শুধু নিজেকে আর নিজে কী করেছি তা নিয়ে ভাবতাম।



তেরো বছর বয়সে আমি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ার মতো কঠোর পরিশ্রম করতাম। আমি হতে চেয়েছিলাম ব্রেন সার্জন। কারণ মনে হয়েছিল এটি সবচেয়ে কঠিন বিষয়। আমি প্রতিদিন সকাল ছয়টায় ঘুম থেকে উঠতাম এবং রাত দুটোর আগে ঘুমাতে যেতাম না। সারাক্ষণ পড়াশোনা করতাম। ভাবতাম আমার লক্ষ্য অর্জন করতেই হবে।

আমার মনে হতো আমার শিক্ষক এবং ক্লাসমেটেরা আমার কাছ থেকে এরকমটাই আশা করতো। আমি পরীক্ষায় ভালো নম্বর না পেলে তারা অবাক হতো। আমার বাবা-মা আমাকে পড়াশোনার জন্য চাপ দিতেন না, তবে আমার প্রত্যাশা ছিল অসীম।

এখন বুঝতে পারছি, আমি যা অর্জন করতে চেয়েছিলাম, তার জন্য অত কঠোর পরিশ্রম না করলেও চলতো এবং আমি জীবনটাকে খানিক উপভোগ করতেও পারতাম।

আমাদের ভবিষ্যতের জন্য পড়াশোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটির অগ্রাধিকার দেয়া উচিত সবার ওপরে। তবে পড়ালেখা যেন আমাদের জীবনটাকেই গ্রাস না করে ফেলে। স্কুলকেন্দ্রিক কিশোর-কিশোরীরা পরীক্ষায় ভালো নম্বর তুলবার জন্য এমন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, তারা ভুলে যায় স্কুলে আসার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল কিছু শেখা। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে প্রমাণ করেছে, স্কুলে খুব ভালো ফলাফল করেও একটি স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করা সম্ভব।

বাবা-মা-কেন্দ্রিক

বাবা-মা তোমাদের জীবনের স্নেহ-ভালোবাসা এবং গাইডেন্সের শ্রেষ্ঠতর উৎস হতে পারেন এবং তোমরা বাবা-মাকে অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান করো, তাই বলে জীবনটাকে বাবা-মা-কেন্দ্রিক করে ফেলো না এবং শুধু তাঁদেরকে খুশি করার জন্য জীবন যাপন দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠতে পারে। (একথা আবার তোমাদের বাবা-মাকে বলতে যেয়ো না। তাহলে তাঁরা হয়তো বইটি তোমাদেরকে পড়তেই দেবেন না... আরে না, ঠাট্টা করছিলাম)

বাবা-মা-কেন্দ্রিক হওয়ায় একটি মেয়ের জীবনে কী ঘটেছিল তা তার জবানীতেই শোনা যাক:

আমি সবসময় কঠোর পরিশ্রম করতাম। জানতাম তাতে আমার বাবা-মা খুব খুশি হবেন। আমি ছয়টি পরীক্ষায় A+ পেয়েছিলাম, একটিতে শুধু B+। এতেই আমার বাবা-মা'র চোখে ঘনিয়ে আসে আঁধার। তাঁরা জানতে চান, কেন

আমি B+ পেলাম, A+ নয়। আমি তখন বহুকষ্টে কান্না আটকেছি। ওঁরা আমার কাছে কী চান?

পরবর্তী দুই বছর আমি আরও কঠোর পরিশ্রম করি বাবা-মাকে খুশি করার জন্য। আমি নেটবল খেলতাম যাতে তাঁরা খুশি হন—কারণ তাঁরা আমাকে কখনো খেলাধুলা করতে দেখেননি। আমি ক্লাসের সেরা ছাত্রী ছিলাম। সবসময় A+ পেয়েছি যেমনটা তাঁরা আশা করেছিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল কলেজের পড়াশোনা শেষে টিচার হবো। কিন্তু ওতে বেতন কম বলে বাবা-মা রাজি ছিলেন না। তাঁরা চাইতেন আমি অন্য কিছু করি।

আমি যে সিদ্ধান্তই নিতাম, মনে প্রশ্ন জাগতো বাবা-মা কি আমাকে এটা করতে দেবেন? তাঁরা কি এ নিয়ে গর্ববোধ করতে পারবেন? ওঁরা কি আমাকে ভালোবাসেন? তবে আমি যাই করেছি তা যথেষ্ট ছিল না। আমি আমার গোটা জীবন যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য বয়ে চলেছি, বাবা-মা'র পছন্দই হয়েছে কিন্তু আমাকে তা সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আমি দীর্ঘদিন ধরে শুধু আমার বাবা-মাকে খুশি করেই গিয়েছি। কিন্তু নিজেকে মনে হয়েছে মূল্যহীন, অপদার্থ, অকিঞ্চিৎকর একজন মানুষ।

অবশেষে আমি বুঝতে পারি, যদি নিজের মতো করে চলতে না পারি, নিজের মতামতকে গুরুত্ব না দিই, স্রেফ ধ্বংস হয়ে যাবো। তারপর থেকে আমি নিজের মতো করে চলতে শুরু করি। এখন আমি অনেক ভালো এবং সুখে আছি। বাবা-মাও তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন, আমাকে এতদিন চাপে রেখেছিলেন বলে তাঁরা ক্ষমা চেয়েছেন। মনে পড়ে না আমার আঠারো বছরের আগে বাবা কখনো আমাকে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' কথাটি বলেছেন কিনা। তবে এটি তিনি যেদিন বললেন, মনে হলো এরচেয়ে মধুর বাক্য পৃথিবীতে নেই। আমি এখনও আমার বাবা-মায়ের মতামতের মূল্য দিই, তবে নিজের জীবনের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নিয়েছি এবং নিজেকেই সবার আগে খুশি করার চেষ্টা করি।

আরও কিছু বিষয়

স্পোর্টসকেন্দ্রিক, হিরোকেন্দ্রিক, শত্রুকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক, এরকম আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যা টিনেজারদের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

কেউ কেউ আছে খেলাধুলায় এতো বেশি মজে যায় যে, এটা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তাই করতে পারে না। কেউ হয় হিরোকেন্দ্রিক। হয়তো তুমি তোমার জীবন গড়ে তুললে কোনো রক তারকা, বিখ্যাত অ্যাথলেট বা প্রভাবশালী

রাজনীবিদের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তাঁরা যখন মারা যাবেন তখন কী হবে? তোমার স্বপ্নেরও মৃত্যু ঘটবে।

কেউ আছে শত্রুকেন্দ্রিক। সারাক্ষণ চিন্তা করে তার চারপাশের সবাই শত্রু, সবাই তাকে ঘৃণা করে। অনেকটা ক্যাপ্টেন হুকের মতো, যার সারাজীবন কিনা কেটেছে পিটারপ্যানকে ঘৃণা করে।

অনেকেই আত্মকেন্দ্রিক হয়। এরা ভাবে জীবন এবং পৃথিবী শুধু তাকে নিয়েই ঘুরছে। তোমরা যদি আত্মকেন্দ্রিক হও, দেখবে সারাক্ষণ নিজের এ অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছো।

এসব 'কেন্দ্রিকতা' খুব বাজে জিনিস। এতে জীবনে কোনো স্থিতি আসে না। বলছি না যে আমাদের কোনো কিছুতেই দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিংবা বন্ধুবান্ধব অথবা বাবা-মা'র সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তোলার দরকার নেই। অবশ্যই আছে। তবে নিজের গোটা অস্তিত্ব এবং প্যাশন বা আবেগের মধ্যে একটি ফারাক রাখা দরকার। এবং এ সীমারেখাটি আমাদের কারোরই ডিঙানো উচিত নয়।

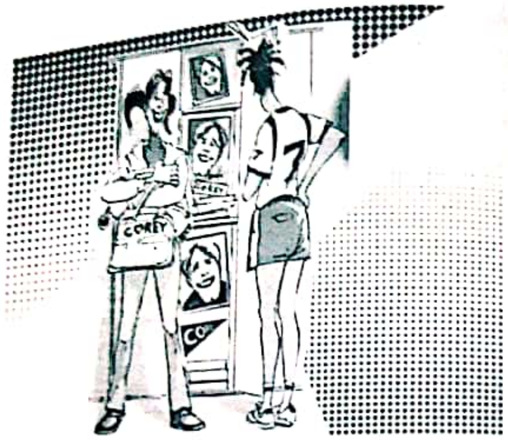
নীতিকেন্দ্রিক—আসল জিনিস

আমরা শূন্যে বল ছুড়ে মারলে সেটি মাটিতে এসে পড়বে। এটি প্রকৃতির আইন বা মূলসূত্র। এরকম অসংখ্য আইন বা নীতি রয়েছে যা ফিজিক্যাল পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে, মানুষের দুনিয়া। এসব নীতি কোনো ধর্মীয় বিষয় নয়। তারা নয় আমেরিকান কিংবা চাইনিজ। তারা তোমার বা আমার নয়। এ নীতি বা আইন ধনী গরীব, রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী সকলের জন্য সমান। একে কেনা বা বিক্রি করা যায় না। তুমি নীতি নিয়ে চললে শ্রেষ্ঠতর হবে, নীতিভ্রষ্ট হলে ব্যর্থ হবে।

যেমন ধরো—সততা একটি নীতি। সেবা একটি নীতি। ভালোবাসা একটি নীতি। কঠিন পরিশ্রম একটি নীতি। সম্মান, কৃতজ্ঞতা, সংযম, বিশ্বস্ততা, দায়িত্ব ইত্যাদি সবই নীতি। এরকম বহু নীতি রয়েছে। এগুলোকে চেনা কঠিন নয়। কম্পাস যেমন সবসময় উত্তর দিকে দিক নির্দেশ করে তোমার অন্তরও প্রকৃত নীতিগুলো চিনে নিতে পারবে।

নীতি কখনো ব্যর্থ হয় না

নীতি নিয়ে বসবাসের জন্য মনে বিশ্বাস রাখতে হয়, বিশেষ করে তুমি যখন এমন এক পৃথিবীতে বাস করছো, যেখানে চলছে মিথ্যাচার, ঠকবাজি, শোষণ ইত্যাদি।



সততার নীতি গ্রহণ করো

তুমি যদি মস্ত কোনো মিথ্যাবাদী হও, সততাকে হয়তো পাশ কাটিয়ে যাবে। তবে একটা সময় ঠিকই দেখবে মিথ্যাবাদীরা জীবনে খুব কমই সফল হয়েছে। বিখ্যাত পরিচালক সেসিল বি ডেমিল তাঁর ক্লাসিক ছবি 'দ্য টেন কমান্ডমেন্টস' এ বলেছেন, 'আমাদের পক্ষে আইন ভাঙা অসম্ভব। শুধু আইনের বিরুদ্ধে আমরা নিজেদেরকে ভাঙতে পারি।'

যে নীতির কথা বলা হলো তা কখনও তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তুমি এসব নীতি নিয়ে এগিয়ে চললে অবশ্যই জীবনে সফল হবে। কাজেই সিদ্ধান্ত নাও আজ থেকে এই নীতিকেন্দ্রিক হবে তোমার জীবন। যেখানে সমস্যা দেখবে, নীতি খুঁজবে। বেরিয়ে আসবে সমস্যার সমাধান।

যদি মনে হয় জীবনের কাছে তুমি পরাজিত, তাহলে ভারসাম্যর নীতি গ্রহণ করো। যদি দেখো কেউ তোমাকে বিশ্বাস করছে না, সততার নীতি তোমাকে এ সমস্যা থেকে উদ্ধার করবে।

নিচের গল্পটিতে আনুগত্য বা বিশ্বস্ততা নীতির কথা বলা হয়েছে।

ফ্রান্সে একই বাহিনীতে দুই ভাই যুদ্ধ করছিল। একজন জার্মানদের বুলেটের আঘাতে মাটিতে পড়ে যায়। যে ভাইটি পালিয়ে বেঁচে এসেছিল সে তার অফিসারের কাছে অনুমতি চায় তার ভাইকে নিয়ে আসার জন্য।

'ও বোধহয় এতক্ষণে মারা গেছে,' বললেন অফিসার। 'নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওর লাশ নিয়ে আসতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।'

কিন্তু ছেলেটি বার বার আকুতি মিনতি করলে অফিসার শেষে তাকে অনুমতি দিলেন। তবে সৈনিকটি ভাইকে কাঁধে ফেলে নিজের কোম্পানিতে ফিরে আসার সময় সে মারা গেল।

'দেখলে,' বললেন অফিসার, 'তুমি খামোকা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছো।'

'না,' জবাব দিল টম। 'আমার ভাই আমার কাছ থেকে যা আশা করেছিল আমি তাই করেছি'। এবং সেই পুরস্কারও পেয়েছি। ওকে যখন আমি কাঁধে তুলে নিচ্ছিলাম ও তখন ফিসফিস করে বলছিলো, 'টম, জানতাম তুই আসবি, বারবার মনে হচ্ছিলো তুই ফিরে আসবি।'

ছোট ছোট পদক্ষেপ

আমি তোমাদেরকে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে ছোট ছোট পদক্ষেপের কথা বলবো যা অনুসরণ করা তোমাদের জন্য সহজ হবে। তোমরা এতক্ষণে যা পড়েছো তারই নির্যাস আসলে থাকবে এ ছোট পদক্ষেপগুলোয়। এগুলোই একসময় শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হয়ে বড় লক্ষ্য পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কাজেই চলো, কিছু ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাক।

১) পরেরবার যখন আয়নায় নিজেকে দেখবে নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক কোনো কথা বলবে।

২) আজই কারও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করো। বলো, 'বাহ! তোমার আইডিয়াটি তো বেশ কাজের!'

৩) নিজের কোনো সীমাবদ্ধ দৃষ্টান্তের কথা চিন্তা করো, যেমন 'আমি বহির্গামী নই।' এখন এই দৃষ্টান্তের একদম বিপরীত কিছু একটা করো।

৪) কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা ভাবো, যে সম্প্রতি একটু উদ্ভট আচরণ করছে। তারপর এ আচরণের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করো।

৫) যখন তোমার কোনো কাজককর্ম থাকে না তখন কী চিন্তা করো? মনে রেখো, তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও কিন্তু তোমার প্যারাডাইম/দৃষ্টান্ত বা জীবনকেন্দ্রিক হতে পারে।

৬) আজ থেকে অন্যদের সঙ্গে এমন আচরণ শুরু করো, যেমনটি তাদের কাছ

থেকে তুমি আশা করছো। অধৈর্য হয়ো না, কাউকে গালাগাল দিয়ো না, তাহ
অপরের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরন পাবে না।

৭) একটি নির্জন জায়গা খুঁজে বের করো। ভাবো তোমার কাছে কী সর্বাধি
গুরুত্বপূর্ণ?

৮) যে গান ঘন ঘন শুনছো সেগুলোর কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনো। তুমি যেস
নীতিতে বিশ্বাস করো তার সঙ্গে গানের কথাগুলো যায় কি?

৯) যখন বাড়ির কাজ করবে, সেটা ক্লাসের কাজ হোক বা ঘরের কাজ, কঠি
পরিশ্রম করার নীতি মেনে চলবে।

১০) পরবর্তীতে যখন কঠিন কোনো অবস্থায় পড়বে এবং বুঝতে পারছো ন
করণীয় কী, নিজেকে জিজ্ঞেস করো, 'কী নীতি আমি প্রয়োগ করবো? (সতত
ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, কঠোর পরিশ্রম ধৈর্য ইত্যাদি)। তখন ওই নীতিগুলো
অনুসরণ করো এবং আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

ব্যক্তিগত বিষয়

ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
আয়নার মানুষটির সঙ্গে শুরু করো

অভ্যাস-১ প্রোঅ্যাক্টিভ হও
আমিই শক্তি

অভ্যাস-২ শেষের থেকে শুরু করো
নিজেই নিজের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করো, নতুবা অন্য কেউ করবে

অভ্যাস-৩ আগের কাজ আগে
ইচ্ছা শক্তি এবং ভাবনা'র শক্তি

ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

জীবনের পাবলিক অ্যারেনায় জিতবার আগে তোমাকে নিজের কিছু ব্যক্তিগত লড়াইয়ে জয়লাভ করতে হবে। সকল পরিবর্তন শুরু হবে তোমাকে নিয়ে।

নিজেকে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাবতে কেমন লাগবে? ধরো এটা তোমার পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। (PBA) অনেকটা সঞ্চয়ী বা চলতি হিসাবের মতো, যেখানে তুমি অর্থ সঞ্চয় করতে পারো এবং প্রয়োজনে টাকাও তুলতে পারো। ধরো, আমি যখন কোনো প্রতিশ্রুতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকি, নিজেকে নিয়ন্ত্রিত মনে হয়। এটা হলো একটা ডিপোজিট বা সঞ্চয়। আর যখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তখন হতাশা বোধ করি। এটি হলো ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন।

তো তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। তোমার PBA-র অবস্থা কী? নিজের ওপর তোমার কতোটা আস্থা এবং বিশ্বাস রয়েছে? তুমি কি খুব চাপে আছো নাকি দেউলিয়া হয়ে গেছো? নিচের তালিকা তোমার নিজেকে মূল্যায়নের ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে।

একটি দুর্বল PBA বা পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

* চাপে পড়লে তুমি সহজেই নিজেকে গুটিয়ে ফেলো।
* ডিপ্রেশন এবং হীনমন্যতার সঙ্গে তোমাকে লড়াই করতে হয়।
* লোকে তোমাকে নিয়ে কী ভাববে, তা নিয়ে সবসময় শংকিত থাকো।
* নিজের নিরাপত্তাহীনতাগুলোকে আড়াল করতে তুমি হামবড়া ভাব দেখাও।
* মাদক, পর্নোগ্রাফি, গুন্ডামি ইত্যাদির কারণে তুমি নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনছো।
* তুমি সহজেই ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠো, বিশেষ করে কাছের কোনো মানুষ সফল হলে।

একটি স্বাস্থ্যকর PBA-র লক্ষণ

* তুমি নিজের দুর্বলতাগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারো।
* জনপ্রিয় হওয়া নিয়ে তোমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

* জীবনকে তুমি ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখো।
* নিজের ওপর তোমার আস্থা রয়েছে।
* তুমি লক্ষ্যস্থির করতে জানো।
* অন্যদের সাফল্যে তোমার চোখ টাটায় না বরং খুশি হও।

তোমার পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অবস্থা নিম্নগামী হলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আজ থেকেই ওখানে দশ-বিশ টাকা রাখতে শুরু করো। একসময় ফিরে পাবে নিজের আত্মবিশ্বাস। ছোট ছোট সঞ্চয় একসময় তোমার ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে ভরে তুলবে।

বিভিন্ন টিনেজ দলের সহায়তায় আমি ছয়টি প্রধান ডিপোজিট বা সঞ্চয়ের একটি তালিকা করেছি, যা তোমার PBA গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তবে প্রতিটি ডিপোজিটেরই সমান এবং বিপরীত উইথড্রয়াল (টাকা তুলে নেয়া) রয়েছে।

PBA ডিপোজিট	**PBA উইথড্রয়াল**
* নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা	নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ
* ছোট ছোট দয়ালু কাজ করা	নিজের মধ্যে ডুবে থাকা
* নিজের প্রতি নম্র হওয়া	নিজেকে অত্যাচার করা
* সৎ হওয়া	অসৎ হওয়া
* নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলা	নিজেকে ধ্বংস করা
* নিজের প্রতিভাকে উজ্জীবিত করা	নিজের প্রতিভাকে অবহেলা করা

নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা

তোমার এমন কোনো বন্ধু আছে যে কথা দিয়ে কথা রাখে না? ফোন করে বলে আসবে কিন্তু আসে না। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু তা রক্ষা করে না। এরকম বন্ধুদের একটা পর্যায়ে আর বিশ্বাস করা যায় না। তাদের প্রতিশ্রুতির কোনো দামই থাকে না। একই ঘটনা তোমার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে যদি তুমি নিজের কাছে দেয়া প্রতিজ্ঞা নিজেই ভঙ্গ করো। যেমন 'আমি কাল সকাল ছয়টায় ঘুম থেকে উঠবো,' অথবা 'বাড়ি ফিরেই আমার হোম ওয়ার্ক করে ফেলবো।' এসব প্রতিজ্ঞা তুমি রক্ষা করতে না পারলে একটা সময় নিজের প্রতিই হারিয়ে ফেলবে আস্থা।

আমরা নিজেদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিই তা রক্ষা করা উচিত। এবং অন্যদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলে তাও অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। যদি মনে হয়

জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছো, তাহলে যেটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তার ওপর নজর দাও—নিজের ওপর। নিজেকে প্রতিশ্রুতি দাও এবং তা রক্ষা করো। ছোট ছোট প্রতিজ্ঞা করো, যা রক্ষা করতে পারবে। এটা অনেকটা মাটির ব্যাংকে পাঁচ-দশ টাকা জমানোর মতো। তুমি জানো এভাবে অল্প অল্প সঞ্চয় করলে একসময় ব্যাংক ভরে যাবে।

ছোট ছোট দয়ালু কাজ করো

একবার এক মনোবিজ্ঞানীর লেখায় পড়েছিলাম, তুমি যদি খুব হতাশ বোধ করতে থাকো তাহলে কারও কিছু উপকার করো। দেখবে মন ভালো লাগবে, কেটে যাবে হতাশা।

একবার আমি এয়ারপোর্টে বসেছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম আমার ফ্লাইটের জন্য। আমার মনে খুব ফূর্তি, কারণ ফার্স্টক্লাসের টিকিট পেয়েছি। প্রথম শ্রেণীর আসনগুলো বেশ বড়, খাবার অনেক সুস্বাদু আর ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টরাও অনেক যত্ন নেয়। তাছাড়া গোটা প্লেনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সিটখানাও আমার ভাগ্যে জুটেছে। সিট 'A'। প্লেনে ওঠার আগে লক্ষ্য করলাম, এক ভদ্রমহিলা অনেকগুলো লাগেজ নিয়ে এসেছে, সঙ্গে শিশু সন্তান। সে তারস্বরে কাঁদছে। আমার বিবেক তখন আমাকে ধাতানি দিল, 'ওরে গর্দভ, তোর টিকিটটা ওই মহিলাকে দিয়ে দে।' আমি একটু দোনামোনা করে শেষে মহিলাকে বললাম, 'এক্সকিউজ মি, আমার মনে হয় এই ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটটি আমার চেয়ে আপনার বেশি দরকার। আমি জানি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে প্লেন ভ্রমণ কতো ঝক্কির। আপনার টিকিটটা আমাকে দিন।'

'আর ইউ শিওর?'

'ওহ, ইয়াহ। আই রিয়েলি ডোন্ট মাইন্ড। তাছাড়া প্লেনে বসে সারাক্ষণ আমাকে কাজ করতে হবে।'

'অনেক ধন্যবাদ। আপনার অনেক দয়া।' মহিলার সঙ্গে আমি টিকিট বিনিময় করলাম।

প্লেনে ওঠার পরে নিজের কাছেই অবাক লাগছিলো, মহিলাকে আমার সিটে বসতে দেখে আমার ভালো লাগছিল বলে। মহিলার সিট নম্বর 24B। তবে এ আসনে বসতে আমার মোটেই খারাপ লাগছিল না। ফ্লাইটের এক পর্যায়ে আমি চিন্তা করলাম, একবার ঢুঁ মেরে আসি তো, দেখি মহিলা কী করছে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। চলে এলাম ফার্স্টক্লাস সেকশনে। যে পর্দাটি ফার্স্টক্লাস থেকে ইকোনমি ক্লাসকে আলাদা করে রেখেছে সেটি একটু ফাঁক করে ভেতরে

জানালাম। দেখি মহিলা এবং তার বাচ্চা দু'জনেই আরামদায়ক, বড় আসনটিতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার মিলিয়ন পাউন্ডের *চার্চিং* (ডিপোজিট) সুখ অনুভূত হলো। তারপর থেকে আমি এ ধরনের কাজ করে আসছি।

জেনি নামে একটি কিশোরী নিচের গল্পটি বলেছে। অন্যদের সাহায্য করে সে কী সুখ পেয়েছিল তারই কাহিনী।

আমাদের এক পড়শী মেয়ে ছিল। খুব গরিব। সে তার বাবাকে নিয়ে আমাদের ফ্লাটে থাকতো। গত তিন বছর ধরে আমি তাকে আমার জামাকাপড় দিয়ে আসছি। আমি তাকে আমার জামা দেয়ার পরে বলতাম, 'এ ড্রেসটাতে তোমাকে বেশ মানাবে.' কিংবা 'এটা পরে দেখো তো কেমন লাগে!'

সে যখন আমার দেয়া ড্রেস পরতো, আমার খুব ভালো লাগতো। সে বলতো, 'নতুন শার্টটির জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' আমি জবাব দিতাম, 'এ রঙটিতে তোমাকে দারুণ লাগছে।' আমি সবসময় লক্ষ্য করতাম ও যেন আমার কোনো কথায় মনে আঘাত না পায় কিংবা না ভাবে, ওরা গরিব বলে আমি ওদেরকে জামাকাপড় দিচ্ছি। ও আমার জামাকাপড় পরে আনন্দে আছে বলে আমারও অনেক ভালো লাগছে।

যাও, তোমার চেনা বা জানা সবচেয়ে নিঃসঙ্গ মানুষটিকে গিয়ে হ্যালো বলো। যে তোমার জন্য কিছু করেছে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লেখো।



নিজের প্রতি নম্র হও

নম্র হওয়ার অনেক মানে আছে। এর অর্থ এই নয় যে, কাল সকালেই তোমাকে একজন পারফেক্ট মানুষে রূপান্তরিত হতে হবে। তুমি যদি তোমার ভুলটি দেরিতে বুঝতে পারো, তোমার বিকাশ যদি হয় দেরিতে, সমস্যা নেই, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাই। কাজেই ধৈর্য ধরো এবং নিজেকে বিকশিত করতে, ভুল সংশোধনে সময় দাও।

নম্র হওয়া মানে তুমি যখন কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো, সেটার জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে শেখা। আর আমরা তো ভুল থেকেই শিখি। তবে যা গেছে গেছে, তা নিয়ে ভেবো না। শুধু চিন্তা করো ভুলটা কী ছিল এবং কেন এটা হলো? প্রয়োজনে ত্রুটিমুক্ত করো নিজেকে। তারপর এটার ভাবনা ভুলে গিয়ে সামনে এগিয়ে যাও।

সৎ হও

সততা বিষয়টির নানান রূপ থাকতে পারে। প্রথমেই আসে সেলফ অনেস্টি বা আত্মসততার কথা। আমি জানি আমি ভুয়া একজন লোক কিন্তু দেখাতে চেষ্টা করি আমি তা নই। এটা আত্ম সততার বিপরীত চিত্র। সততার পরিচয় দিতে হবে কাজেকর্মে। তুমি কি স্কুলে বা তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে সৎ? যদি অতীতে তুমি অসৎ হয়ে থাকো, যেটি আমরা কমবেশি সবাই, সেক্ষেত্রেও বলবো সৎ হওয়ার চেষ্টা করো। এবং দেখবে কেমন অনুভূতি জাগছে মনে। মনে রেখো অন্যায় বা ভুল কিছু করলে কিন্তু মন সবসময় খচখচ করবে।

আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, আমার ক্লাসে তিনটে ছেলে ছিল যারা অংকে ছিল কাঁচা। আর আমি অংক খুব ভালো পারতাম। ওদেরকে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়ার জন্য পরীক্ষা পিছু পাঁচ পাউন্ড করে নিতাম। পরীক্ষার প্রশ্ন হতো মালটিপল চয়েসে, কাজেই ছোট এক টুকরা কাগজে সমস্ত প্রশ্নের জবাব লিখে নিয়ে আমি ওদেরকে দিতাম।

শুরুতে ভাবতাম কাজ করে পয়সা কামাচ্ছি। মন্দ কী? কিন্তু তখন ভেবে দেখিনি এটি আমাদের সবাইকে আঘাত করতে পারে। পরে বুঝতে পারি এ কাজটা আমার করা উচিত হচ্ছে না। কারণ, আমি তো আসলে ওদেরকে কোনো সাহায্যই করছি না। স্রেফ নকল করতে সাহায্য করছি। ওরা শিখছে না কিছুই। ফলে ওরা পড়ালেখায় ভালো করতে পারবে না। এই যে নকলবাজি, এটা কিন্তু আমার মনে একটুও সুখ দেয়নি।

তোমার চারপাশে অনেক ঠকবাজ দেখবে। এদের মধ্যে সৎ হয়ে থাকতে সাহসের দরকার বৈকি। তবে স্মরণে রেখো, প্রতিটি সততার কাজ মানে তোমার PBA-তে ডিপোজিট বা সঞ্চয় করছো এবং এতে তোমার শক্তি তৈরি হচ্ছে। প্রবাদ আছে সততাই সর্বোত্তম পন্থা।

নিজেকে নতুনের মতো তৈরি করো

নিজেকে নতুনের মতো তৈরি করতে তোমার সময় লাগবে। যদি তা করতে ব্যর্থ হও তবে জীবনের আনন্দই হারিয়ে ফেলবে।

তোমরা হয়তো ফ্রান্সিস হজসন বারনেটের '*দ্য সিক্রেট গার্ডেন*' বইটি পড়েছো, কিংবা নাম শুনেছো। এটি মেরি নামে এক কিশোরীর গল্প। তার বাবা-মা দুর্ঘটনায় মারা গেলে সে তার ধনবান চাচার বাড়িতে যায় থাকার জন্য। চাচা তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে খুবই গম্ভীর হয়ে গেছেন। কারও সঙ্গে মেশেন না, কথাটথাও তেমন বলেন না, সকলের সঙ্গে তাঁর আচরণ শীতল। তিনি অতীত জীবন থেকে রেহাই পেতে বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন।

তাঁর এক ছেলে ছিল। বেচারার জীবন বড়ই দুঃখের। সে সবসময় অসুস্থ থাকে এবং হুইল চেয়ার ছাড়া চলাফেরা করতে পারে না। বিরাট প্রাসাদের একটি অন্ধকার জায়গায় থাকতো ছেলেটি।

এই নিতান্তই নিঃসঙ্গ পরিবেশে কিছুদিন কাটানোর পরে মেরি প্রাসাদের কাছে একটি সুন্দর বাগান আবিষ্কার করলো। এ বাগানটির ফটক বহুদিন ধরে তালাবদ্ধ ছিল। তবে মেরি এখানে প্রবেশের একটি গোপন পথ পেয়ে যায় এবং নিজের গুমোট পরিবেশ থেকে রক্ষা পেতে সে প্রতিদিন এ বাগানে আসতে থাকে। এটি হয়ে ওঠে তার আশ্রয়স্থল, তার গোপন বাগিচা।

কিছুদিন পরে মেরি তার পঙ্গু চাচাত ভাইটিকেও এ বাগানে নিয়ে আসতে শুরু করে। বাগানটির অপূর্ব সৌন্দর্য মুগ্ধ করে তোলে ছেলেটিকে। সে আবার হাঁটতে শেখে এবং ফিরে পায় সুখ। একদিন, মেরির রাশভারী চাচা, দেশ সফর শেষে বাড়ি ফিরে শুনতে পান কেউ নিষিদ্ধ বাগানটিতে খেলা করছে। তিনি রেগে ওখানে ছুটে যান। অবাক হয়ে দেখেন তাঁর ছেলে হুইল চেয়ার বাদ দিয়ে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে বাগানে আনন্দিত চিত্তে। এ দৃশ্য তাঁকে যেমন অবাক করে দেয় তেমনি আনন্দে চোখে এনে দেয় অশ্রু। তিনি বহু বছর পরে পুত্রকে আলিঙ্গন করেন। বাগানটির রূপ এবং জাদু পরিবারটিকে আবার মিলিত করে।

আসলে আমাদের সবারই এরকম একটি বাগান দরকার, যেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারবো, আমাদের শক্তি নতুন করে ফিরে পাবো। তবে এ সুখ বা

আনন্দ পেতে হলে গোলাপ বাগিচা, পাহাড়চূড়া কিংবা সমুদ্র সৈকত না হলেও চলবে। এটি হতে পারে বেডরুম কিংবা বাথরুমও, শুধু যেখানে একটু একা হওয়া যায়। থিও নামের কিশোরটি তার লুকানো আস্তানার বিষয়ে বলেছে :

'যখন আমার খুব মন খারাপ হয় কিংবা মানসিক চাপে থাকি অথবা বাবা-মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়, আমি চলে যাই বেসমেন্টে। ওখানে রয়েছে একটি হকি স্টিক, একটি বল এবং একটি নগ্ন কংক্রিটের দেয়াল, যেখানে আমার হতাশা ঝাড়তে পারি। আমি আধঘণ্টা বল ছুড়ি দেয়ালে তারপর তাজা মন নিয়ে ফিরে যাই ওপরে। বেসমেন্টে বসে হকি প্রাকটিস করতে গিয়ে আমার খেলায় উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে তারচেয়েও বেশি ছিল আমার বাবা-মা'র সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ণ।'

অ্যালিসন তার নিজের বাগানটি খুঁজে পেয়েছিল

আমার বাবা কারখানায় কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান। তখন আমি ছোট। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আমার জানা নেই, কারণ মাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে ভয় পেতাম। আমি আমার মনের মধ্যে বাবার একখানা ছবি তৈরি করে নিয়েছিলাম, যেটি আমি কোনোদিন পরিবর্তন করতে চাই না। আমার চোখে আমার বাবা একজন যথার্থ মানুষ, যিনি এখানে উপস্থিত থাকলে আমাকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। তবে আমার ভাবনায় তিনি সবসময়ই আছেন এবং আমি কল্পনা করি, বাবা এখানে থাকলে আমাকে কীভাবে সাহায্য করতেন।



বাবাকে যখন আমার দরকার হয় আমি স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের খেলার মাঠের স্লাইডে চড়ে বসি। কেন জানি মনে হয় সবচেয়ে উঁচু এ জায়গাটিতে এলে বাবাকে আমি অনুভব করতে পারবো। তাই আমি স্লাইডের মাথায় উঠে ওখানে শুয়ে থাকি। আমি মনে মনে বাবার সঙ্গে কথা বলি এবং মনে হয় তিনিও আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি চাই তিনি আমাকে স্পর্শ করুন। যদিও জানি এটি সম্ভব নয়। যখনই কোনো কিছু নিয়ে আমার খুব মন খারাপ হয় আমি চলে যাই ওখানে। আমার বোঝাটা বাবার সঙ্গে শেয়ার করে যেন নিজেকে হালকা করি।

নিজের মনের বোঝা হালকা করার জায়গা খুঁজে পাবার পাশাপাশি আরও অনেক রাস্তা আছে, যেখানে তুমি নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করতে পারবে এবং নির্মাণ করতে পারবে তোমার PBA. এজন্য এক্সারসাইজ করতে পারো। যেমন হাঁটাহাঁটি, দৌড়, নাচ অথবা কোনো ব্যাগে পাঞ্চিং বা ঘুষোঘুষি করা। কোনো টিনেজার মন খারাপ কাটাতে পুরানো দিনের সিনেমা দেখে, কোনো মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়ে, ছবি এঁকে অথবা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে যারা উৎসাহ দিতে পারে।

নিজের প্রতিভাকে উজ্জীবিত করো

প্রতিভার খোঁজ পেয়ে তার উন্নয়ন সাধন, শখ কিংবা বিশেষ কিছুতে আগ্রহ হতে পারে তোমার PBA -র জন্য সবচেয়ে বড় সঞ্চয়।

ট্যালেন্ট বা প্রতিভার কথা ভাবলেই আমরা কেন ট্রাডিশনাল হাই প্রোফাইল ট্যালেন্টদের কথা চিন্তা করি, বুঝি না। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাথলেট, নৃত্যশিল্পী কিংবা পুরস্কার বিজয়ী কোনো শক্তিও। তবে সত্য এই যে, ট্যালেন্ট আসে বিভিন্ন প্যাকেজে। ছোট চিন্তা কোরো না। তোমার হয়তো বই পড়ার অভ্যাস আছে কিংবা লিখতে পারো অথবা তুমি সুবক্তা। তুমি হয়তো একজন সৃষ্টিশীল মানুষও। খুব দ্রুত কিছু শিখে নেয়ার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে তোমার। কিংবা যে কাউকে সহজেই গ্রহণ করতে পারো। তুমি হয়তো একজন ভালো সংগঠক, রয়েছে নেতৃত্বদানের গুণ। তোমার প্রতিভা লুকিয়ে থাকতে পারে দাবা খেলায়, নাটকের অভিনয়ে কিংবা প্রজাপতি সংগ্রহে। তবে সেটি যে-ই হোক, যখন তুমি এ ধরনের কিছু কাজ করছো, এটি নিঃসন্দেহে উৎফুল্ল হওয়ার মতো বিষয়। এটি হলো নিজেকে প্রকাশের একটি রূপ।

আমার শ্যালক ব্রাইস বলেছিল, সে প্রতিভার উন্নয়ন ঘটিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পেরেছে, একটি ক্যারিয়ার খুঁজে পেয়েছে, যা তার

জীবনে এনে দিয়েছে ভিন্নতা। সে বাস করতো আমেরিকায় এবং তার গল্প গড়ে উঠেছে টেটন পর্বতমালাকে ঘিরে। এ পর্বতমালার অবস্থান আইডাহো এবং উওমিংয়ে। টেটন পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গ্রান্ড টেটন, সমুদ্র সমতল থেকে ১৩,৭৭৬ ফুট উঁচুতে।

কিশোর বয়সে খুব ভালো বেসবল খেলতো ব্রাইস। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা তার সবকিছু বরবাদ করে দেয়। একদিন সে একটি বন্দুক নিয়ে খেলা করছিল, হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি তার চোখে বিদ্ধ হয়। অপারেশন করলে চোখটা চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে ডাক্তাররা আর গুলিটি বের করেননি।

মাস কয়েক পরে ব্রাইস বেসবলে ফিরে এলেও আগের মতো আর খেলতে পারছিল না। কারণ তখন তাকে মাত্র একটি বক্ষুর ওপর নির্ভর করে খেলতে হচ্ছিলো। সে বলেছে, এক বছর আগেও আমি তারকা খেলোয়াড় ছিলাম, কিন্তু এখন আমি বলই মারতে পারি না। আমি বুঝতে পারছিলাম আমি আর কিছুই করতে পারবো না। আমার আত্মবিশ্বাসের জন্য এটি ছিল মস্ত আঘাত।

ব্রাইসের দুটি বড় ভাই ছিল। নানা কাজে পারদর্শী ছিল তারা, ব্রাইস ভাবতো এক চোখ নিয়ে সে এখন আর কিইবা করতে পারবে। টেটন পর্বতমালার ধারে তার বাড়ি ছিল বলে সে সিদ্ধান্ত নেয় পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করবে। তাই সে স্থানীয় আর্মি স্টোরে গিয়ে নাইলনের রশি, ক্যারাবাইনার, চক, পিটনসহ পাহাড় বাইবার জন্য আনুষঙ্গিক যা যা দরকার সব কিনে আনলো। সে পাহাড় চড়ার ওপরে বইপত্র পড়লো, শিখলো কীভাবে রশিতে গিট্টু বাঁধতে হয়, হারনেস পাথরের গায়ে আটকাতে হয় ইত্যাদি। প্রথমে সে গ্রান্ট টেটনের ছোট ছোট পাহাড়ে ওঠা শুরু করলো।

প্রাইস শিগ্রি আবিষ্কার করলো, সে পাহাড় বাইবার ওস্তাদ। তার শরীর সুগঠিত, হালকা যা পাহাড়ে চড়ার জন্য খুবই উপযোগী।

বেশ কয়েকবার ট্রেনিং শেষে ব্রাইস গ্রান্ড টেটনের শৃঙ্গে আরোহণ করলো। পাহাড় বাইতে তার সময় লাগলো দুইদিন। চূড়ায় পৌছে তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল।

পাহাড় বাইবার পার্টনার পাওয়া কঠিন ছিল, তাই ব্রাইস একাই ট্রেনিং নিতে লাগল। একটা সময় গ্রান্ড টেটনে আরোহন তার কাছে ডালভাতে পরিণত হলো। একদিন তার বন্ধু কিম তাকে বললো, 'তুমি গ্রান্ড টেটনে ওঠার রেকর্ডটি পারলে ভঙ্গ করো।'

জন গিডেন নামে এক লোক মাত্র চার ঘণ্টা এগারো মিনিটে গ্রান্ড টেটনে আরোহণ করে রেকর্ড গড়েছেন, ব্রাইসকে জানালো কিম।

'এ অসম্ভব,' ভাবলো ব্রাইস। 'এ লোকটির সঙ্গে একদিন দেখা করতে হবে।' তবে ব্রাইস পাহাড়ে চাড়ার অভ্যাস চালিয়ে গেল। সে দৌড়ে এখন পাহাড়ে ওঠে এবং সময়ের হিসেব রাখে। ক্রমে তার দৌড়ের গতি দ্রুততর হয়ে উঠলো। কিম তাকে বললো, 'তুমি রেকর্ডটি ভাঙার চেষ্টা করো। জানি তা পারবে।'

একদিন পাহাড় বাইতে গিয়ে জক গ্লিডেনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে গেল ব্রাইসের। সে এবং কিম জকের তাঁবুতে বসেছিল, কিম, যে নিজেও একজন খ্যাতনামা ক্লাইম্বার, জককে বললো, 'এই লোক আপনার রেকর্ড ভাঙতে চায়।' জক তাকালেন ব্রাইসের ১২৫ পাউণ্ড ওজনের কাঠামোর দিকে। তাঁর চাউনিতে তাচ্ছিল্য। ব্রাইস অপমান বোধ করলেও সামলে নিল নিজেকে। তবে কিম তাকে সাহস যুগিয়েই চললো, 'আমি জানি তুমি এটা পারবে।'

১৯৮১ সালের ২৬ আগস্ট ভোরবেলা, কমলা রঙের ছোট ব্যাকপ্যাক পিঠে ঝুলিয়ে, হালকা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে ব্রাইস দৌড়ে গ্রান্ড টেটনের চূড়ায় উঠল তিন ঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিট চার সেকেন্ডে। সে এ আরোহন পর্বে কেবল দু'বার থেমেছে: একবার জুতোর ভেতর থেকে পাথরখণ্ড বের করতে এবং চূড়ায় উঠে রেজিস্ট্রারে সই করতে যে সে এখানে এসেছিল। দারুণ লাগছিল ব্রাইসের। কারণ সে সত্যি রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

তবে ব্রাইসের এ রেকর্ডও ভেঙ্গে ফেলা হয়। ক্রেইটন কিং নামে এক লোক তিন ঘণ্টা বিশ মিনিট নয় সেকেন্ডে পাহাড় চূড়ায় ওঠে।

এর দুই বছর পর ১৯৮৩ সালের ২৬ আগস্ট ব্রাইস আবার টেটন পর্বতে যায় তার শিরোপা উদ্ধার করতে। এবারে সে মাত্র এক ঘণ্টা তেপ্পান্ন মিনিটে পাহাড় চূড়ায় আরোহণ করে। তবে এবারের আরোহন এবং অবরোহন পর্ব দুটিও তার জন্য খুব কষ্টের ছিল। অক্সিজেনের অভাবে তার চেহারা বেগুনি হয়ে গিয়েছিল। সে নামার সময় আহতও হয়েছে। তবে এতো অল্প সময়ে পাহাড়ে চড়তে পারার জন্য ব্রাইসের নাম ছড়িয়ে পড়ে। সে পরিচিতি পায় বিশ্বের সেরা পর্বতারোহী হিসেবে।

'এটি আমাকে একটি পরিচয় দিয়েছে,' বলেছে ব্রাইস। 'সবাই কিছু না কিছুর জন্য পরিচিত হতে চায়, আমিও চেয়েছিলাম। পাহাড়ে চড়তে পেরে আমার আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেকে আমি এভাবেই প্রকাশ করেছি।'

আজ ব্রাইস অত্যন্ত সফল একটি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। কোম্পানিটি পর্বতারোহীদের জন্য ব্যাকপ্যাক তৈরি করে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার,

ব্রাইস যে কাজটি করতে ভালবাসতো, সেটি করেই জীবিকা নির্বাহ করছে এবং নিজের প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছে। উল্লেখ্য, ব্রাইসের'এ রেকর্ড এখন পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারেনি।

কাজেই বন্ধুগণ, তোমাদের দরকার আত্মবিশ্বাস। নিজের PBA-তে আজ থেকেই আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় শুরু করো। এর ফলাফল পেয়ে যাবে অচিরেই। তবে ডিপোজিট তৈরির জন্য পাহাড়ে চড়ার দরকার নেই। এরচেয়ে অনেক নিরাপদ এবং বহু সহজ রাস্তা রয়েছে।'

ছোট ছোট পদক্ষেপ

নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো

১) যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলে সেভাবে পরপর তিনদিন ঘুম থেকে উঠে পড়ো।

২) এমন সহজ কোনো কাজ বেছে নাও, যেটি অনেকের মধ্যেই করা সম্ভব। যেমন জামাকাপড় ধোয়া, ইংরেজি হোমওয়ার্ক করার জন্য বই পড়া। তুমিই সিদ্ধান্ত নাও কখন করবে কাজটি। এখন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কাজটা করে ফেলো।

৩) আজ কোনো 'থ্যাংক ইউ' নোট লিখে ফেলো। অথবা বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কার করো।

৪) নিজের চারপাশে তাকিয়ে ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করো। যেমন বুড়ো কোনো মানুষকে সাহায্য করলে অথবা যে পড়তে পারে না তাকে কিছু পড়ে শোনাও।

নিজের প্রতিভাকে উজ্জীবিত করো

৫) এ বছরে নিজের কী কী প্রতিভার উন্নয়ন ঘটাতে চাও, তার একটা তালিকা বানিয়ে ফেলো।

আমি যে ট্যালেন্টটির উন্নতি ঘটাবো এ বছর। কীভাবে সেখানে পৌছাবো—

৬) অন্যদের মধ্যে যেসব প্রতিভা তুমি দেখতে পেয়েছো তার একটি তালিকা করে ফেলো।

ব্যক্তি	যে ট্যালেন্টের আমি প্রশংসা করি

নিজের প্রতি নম্র হও

৭) এমন একটি ক্ষেত্রের কথা ভাবো, যেখানে নিজেকে বড় হীনমন্য লাগে। এখন বড় করে দম নিয়ে বলোঃ

'এটাই পৃথিবীর শেষ নয়।'

৮) একটি পুরো দিন কোনোরকম নেতিবাচক চিন্তা করবে না। নেতিবাচক চিন্তা মাথায় এলে তা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ইতিবাচক ভাবনা ভাবো।

নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলো

৯) এমন কোনো মজার কাজের কথা ভাবো যা তোমার স্পিরিট বাড়িয়ে তুলবে। যেমন মিউজিক চালিয়ে নাচতে পারো।

১০) আলস্য লাগছে? এখনই উঠে পড়ে রাস্তা দিয়ে একটু হেঁটে এসো।

সৎ হও

১১) পরেরবার তোমার বাবা-মা যখন জানতে চাইবেন তুমি কী করছো, সত্যি কথাটাই বলবে। কোনোরকম প্রতারণার আশ্রয় নেবে না।

১২) অন্তত: একটা দিন অতিরঞ্জিত বা অলংকার করে কিছু বলো না!

অভ্যাস-১
প্রো-এ্যাকটিভ হও



বাড়িতে বসবাস আমার জন্য ক্রমে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছিল। কেন? কারণ, আমার জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সবকিছুর জন্য বাবা আমাকে দায়ী করতেন।

আমি যদি বলতাম, 'ড্যাড, আমার গার্লফ্রেন্ডও আমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে।' তিনি বলতেন, 'শোনো শন, কেউ তোমাকে পাগল বানাতে পারে না, যদি তুমি নিজে পাগল না হও। ইটস্ ইয়োর চয়েস। তুমি আসলে নিজেই পাগল হতে চেয়েছো।'

অথবা যদি আমি বলতাম, 'আমার নতুন বায়োলজি টিচারটা একদম ভালো না। এর কাছ থেকে আমি কিছুই শিখতে পারবো না।

তিনি বলতেন, 'তুমি তোমার টিচারের কাছে গিয়ে তাঁকে কিছু পরামর্শ দিলেই পারো? অথবা টিচার বদলাও। প্রয়োজনে অন্য আরেকজন শিক্ষক নাও। তুমি যদি বায়োলজি শিখতে না পারো, শন, সেটা তোমার ব্যর্থতা। টিচারের নয়।'

বাবা সবসময় আমাকে চ্যালেঞ্জ করতেন। বলতেন, কারও উপর দোষ চাপানো ঠিক না। তবে আমার মা আবার অন্যদের ওপরে দোষ চাপাতে দিতেন।

আমি প্রায়ই চিৎকার করে বলতাম, 'তুমি ভুল বলছো, ড্যাড। আমি কেন পাগল হতে যাবো? ওই মেয়েটা আমাকে পাগল বানিয়েছে। পাগল। আমাকে আর জ্বালিয়ো না। স্রেফ একটু একা থাকতে দাও।'

তুমি তোমার জীবনের জন্য দায়ী, একজন কিশোর হিসেবে বাবার এ শক্ত ঔষধটি আমার পক্ষে গলাধকরণ করা কঠিন ছিল। তবে অন্যদিকে তাঁর কথায় শিক্ষণীয় একটি ব্যাপারও ছিল। তিনি আমাকে শেখাতে চেয়েছিলেন, পৃথিবীতে দুই ধরনের লোক আছে—প্রো-এ্যাকটিভ এবং রি-এ্যাকটিভ—একদল নিজেদের জীবনের দায়দায়িত্ব নেয়, অপরদল এ জন্য অন্যকে দায়ী করে।

অভ্যাস ১, প্রো-এ্যাকটিভ হও। এটি অন্য সকল অভ্যাসের তালা খোলার চাবিকাঠি। ১নং অভ্যাস বলে, 'আমিই শক্তি। আমিই আমার জীবনের চালক। আমি আমার অ্যাটিটিউড বাছাই করতে পারি। আমার সুখ কিংবা নিরানন্দের জন্য আমিই দায়ী। আমি আমার নিয়তির গাড়ির চালক, যাত্রী নই।'

প্রো-এ্যাকটিভ হও অথবা রি-এ্যাকটিভ পুরোটাই তোমার ইচ্ছা

প্রতিদিন তোমার এবং আমার প্রায় ১০০টি সুযোগ রয়েছে প্রো-এ্যাকটিভ হবে নাকি রি-এ্যাকটিভ? যে কোনোদিন আবহাওয়া খারাপ থাকতে পারে, তুমি কোনো কাজ না-ও পেতে পারো, কেউ তোমার বিরুদ্ধে বদনাম করতে পারে, তুমি স্কুলের নির্বাচনে হেরে যেতে পারো, তুমি পরীক্ষায় ফেল করতে পারো ইত্যাদি। তো এসবের বিরুদ্ধে কী করবে তুমি? সবকিছুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাবে নাকি প্রো-এ্যাকটিভ হবে? তা একান্তই তোমার ইচ্ছা।

রি-এ্যাকটিভ লোকজন ঝোঁক বা আবেগের বশে কাজ করে ফেলে। সেজন্য পরে পস্তায়। কিন্তু প্রো-এ্যাকটিভ মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে কাজ করে। কিছু এ্যাকটিভ করার আগে ভাবে। তারা জানে তাদের জীবনে যা কিছু ঘটছে সব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। প্রো-এ্যাকটিভরা হয় শান্ত, ধীর এবং নিয়ন্ত্রিত।

দৃশ্য এক

তুমি আড়াল থেকে শুনতে পেলে, তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডটি একটি দলের কাছে তোমাকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলছে। সে তো আর জানে না যে, তুমি তার কথা শুনে ফেলেছো। অথচ মাত্র পাঁচ মিনিট আগে এ বন্ধুটিই মিষ্টি করে তোমার সঙ্গে কথা বলেছে। তুমি স্বভাবতই কষ্ট পাবে তার এহেন আচরণে।

রি-এ্যাকটিভ চয়েস

* ওকে গিয়ে চড় কষাতে পারো।
* গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হতে পারো, বন্ধু তোমাকে আজেবাজে কথা বলেছে ভেবে।
* সিদ্ধান্ত নিতে পারো বন্ধুটি দু'মুখো সাপ এবং তার সঙ্গে দুই মাস কথা বলা বন্ধ রাখতে পারো।
* বন্ধুত্ব নিয়ে তুমিও গুজব ছড়াতে পারো, যেহেতু সে একই কাজ করেছে।

প্রো-এ্যাকটিভ চয়েস

* ওকে ক্ষমা করে দেবে।
* ওর মুখোমুখি হয়ে বলবে, তুমি ওর আচরণে কতোটা আঘাত পেয়েছো।
* বিষয়টি পাত্তা না দিয়ে ওকে দ্বিতীয় আরেকটি সুযোগ দেবে। ভাববে ওরও তোমার মতো দুর্বলতা রয়েছে। তুমিও তো ওর অলক্ষে ওর ব্যাপারে মাঝেমধ্যে দু'একটা বাজে কথা বলেছো।



দৃশ্য দুই

তুমি প্রায় বছরখানেক ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে একটি দোকানে কাজ করছো। তিন মাস পরে ওখানে নতুন আরেকজন যোগ দিল। সম্প্রতি তাকে ঈপ্সিত শনিবার বিকেলের শিফটে কাজ দেয়া হলো, যে শিফটি তোমার কাজ করার খুব ইচ্ছে ছিল।

রি-এ্যাকটিভ চয়েস

* তোমার কর্মঘণ্টার অর্ধেক সময়টাই ব্যয় করবে সবার কাছে নালিশ করে যে, সিদ্ধান্তটি কতোটা অন্যায্য ছিল।
* নতুন লোকটির ওপর শ্যেন নজর রাখবে এবং তার যাবতীয় দুর্বলতা খুঁজে বের করবে।
* তোমার মনে এ ধারনা বদ্ধমূল হবে যে, তোমার সুপারভাইজার তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং তোমাকে চাকরিচ্যুত করার ফন্দি আঁটছে।
* তুমি আগের মতো আর আন্তরিকভাবে কাজ করবে না।

প্রো-এ্যাকটিভ চয়েস

* তোমার সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করবে নতুন লোকটি কেন ভালো শিফটে কাজ পেল।
* আগের মতোই কঠোর পরিশ্রম করে যাবে।
* নিজের কাজের আরও কীভাবে উন্নতি করা যায় তা শিখবে।

* তোমার যদি মনে হয়, এ চাকরিতে কোনো ভবিষ্যত নেই তাহলে অন্য চাকরি খুঁজবে।

তোমার ভাষা কী বলে শোনো

প্রো-এ্যাকটিভ এবং রি-এ্যাকটিভ লোকদের ভাষা দুই রকম।

রি-এ্যাকটিভদের ভাষা হয় এরকম:

'আমি এমনই। আমি এমনই থাকবো।' আসলে তারা বলতে চাইছে, আমি যা কিছু তার জন্য আমি দায়ী নই। আমি বদলাতে পারবো না। আমি এভাবেই চলবো এবং এটাই আমার নিয়তি।

'আমার বসটা যদি এমন উদ্ভট না হতো, তাহলে সবকিছু ভিন্নরকম হতো।' আসলে তারা বলতে চাইছে, আমার বস সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী, আমি নই।

'ধ্যাত্তেরি ছাই! তুমি আমার দিনটির বারোটা বাজিয়ে দিলে।' তারা বলতে চাইছে, আমি আমার মুড নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। তুমি করো গিয়ে।

'আমি যদি অন্য স্কুলে পড়তাম, ভালো বন্ধু-বান্ধব পেতাম, আরো বেশি টাকা আয় করতে পারতাম, অন্যরকম একটি ফ্ল্যাটে থাকতে পারতাম, আমার বয়ফ্রেন্ড থাকতো... আমি সুখী হতে পারতাম।' আসলে তারা বলছে, আমি আমার সুখ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। 'জিনিসপত্র' পারে। আর সুখী হতে হলে এসব জিনিসপত্রের দরকার রয়েছে।

রি-এ্যাকটিভ ভাষা	প্রো-এ্যাকটিভ ভাষা
আমি চেষ্টা করবো	আমি এটা করবো
আমি এরকমই	আমি এরচেয়ে ভালো করতে পারবো
আমার আর কোনো রাস্তা নেই	বিকল্প কী কী আছে তা দেখা যাক
আমি পারবো না	কোনো না কোনো উপায় থাকবেই
তুমি আমার মুডটাই দিলে শেষ করে	তোমার খারাপ মুডের দায় আমি নেবো না

প্রো-অ্যাক্টিভ মানুষরা যেমন হয়

প্রো-এ্যাকটিভ মানুষদের ভিন্ন জাতের মানুষ বলা যায়। তারা:

* সহজে অপমানিত হয় না
* নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে
* কাজ করার আগে ভাবে

* খারাপ কিছু ঘটলেও তারা পিছ পা হয় না, ফিরে আসে
* সবসময় কোনো বিকল্প রাস্তা খুঁজে বের করে
* তারা যা করতে পারবে তার ওপর মনোযোগ দেয় এবং যা করতে পারবে না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না।

আমি নতুন একটি চাকরি করতাম। সেখানে অ্যান্ড্রু নামে এক লোক ছিল। জানি না তার সমস্যা কী, কোনো এক কারণে সে আমাকে পছন্দ করতো না। এবং তা প্রকাশ করতে দ্বিধাও করতো না। আমার সঙ্গে বাজে আচরণ করতো, অপমানজনক কথা বলতো। সবসময় আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো এবং অন্যদেরকে ফুঁসলাতো, যাতে তারা আমার বিরোধিতা করে। একবার ছুটি কাটিয়ে কাজে ফিরেছি, আমার এক বন্ধু বললো, 'শন, দোস্ত, অ্যান্ড্রু তোমাকে নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা বলবে। ওর ব্যাপারে সাবধান।'

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো ব্যাটাকে ধরে কড়কে দিই, কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখতাম। ভাবতাম এসব মারামারির মধ্যে যাওয়াটা হাস্যকর দেখাবে। ঠিক করলাম ও যতই আমাকে অপমান করুক, আমি রাগ করবো না এবং ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো। আমার বিশ্বাস ছিল ওতে কাজ হবে।

সত্যি বলতে কী অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফল পেতে লাগলাম। অ্যান্ড্রু দেখলো যে, ওকে আমাকে যতই অপমান করার চেষ্টা করে, আমি রাগ হই না বরং হেসে হেসে কথা বলি। একদিন সে আমাকে বলেই বসলো, 'তোমাকে আমি যত অপমান করার চেষ্টা করেছি কিন্তু দেখলাম তুমি গায়েই মাখছো না।' বছরখানেক পরে আমরা দু'জনে বন্ধু হয়ে গেলাম। আমি যদি ওর হামলার প্রতিবাদে প্রত্যাঘাত করতাম তাহলে আর এ বন্ধুত্বটা হতো না। বন্ধুত্ব করতে হলে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়, সহ্য করতে হয়।

তুমি এ পর্যায়ে আমাকে চিৎকার করে বলতে পারো, 'কাজটা এতো সহজ নয়, শন।' তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করবো না। রি-এ্যাকটিভ হওয়া অনেক সহজ। মেজাজ হারাতেই পারো। নালিশও করতে পারো।

তবে একটা কথা মনে রেখো, তোমাকে পারফেক্ট হতে কেউ বলছে না। বাস্তবে তুমি বা আমি কেউই পুরোপুরি প্রো-এ্যাকটিভ বা রি-এ্যাকটিভ নই, দুটোর মাঝামাঝি। আসলে প্রো-এ্যাকটিভ হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, যাতে অটো পাইলটে তুমি চলতে পারো এবং এ নিয়ে আর ভাবতে না হয়। তুমি যদি প্রতিদিন ১০০ বারের মধ্যে ২০ বার প্রো-এ্যাকটিভ হওয়ার চিন্তা করো, তাহলে ১০০ বারের মধ্যে ৩০ বার এটি হওয়ার কথা ভাবো। তারপর ৪০ বার। ছোট

ছোট পরিবর্তন কী বিশাল পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা ভাবতেও পারবে না। কাজেই ছোট পরিবর্তনগুলোকে অবহেলা করো না।

আমরা শুধু একটা বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি

আমাদের জীবনে যা ঘটছে, তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আমাদের গায়ের রঙ বদলাতে পারবো না, কে এফএ কাপ জিতবে তা বলতে পারবো না, আমরা যেখানে জন্মেছি বা আমাদের বাবা-মা কিংবা অন্যদের আমাদের প্রতি আচরণ কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। তবে একটি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো:

আমাদের জীবনে যা ঘটছে তার প্রতি কীভাবে আমরা সাড়া দেবো। এবং এটাই আসল কথা। এ জন্যেই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা না করাই উচিত। চিন্তা করা দরকার, যা আমরা করতে পারবো তা নিয়ে।

আমরা যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তা হলো নিজেদেরকে, আমাদের অ্যাটিটিউড ইত্যাদি। আর যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে থাকলে জীবনের সুখ-শান্তিই যাবে নষ্ট হয়ে। ধরো, তোমার বোন তোমাকে জ্বালিয়ে মারে এবং এ জন্য তুমি ক্রমাগত নালিশ করে যাচ্ছো। এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রো-এ্যাকটিভরা এক্ষেত্রে অন্যদিকে মনোযোগ দেয়। যেটি তাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এতে তাদের মনে শান্তি থাকে এবং জীবনকে আরও বেশি



তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তারা দুশ্চিন্তাকে পাত্তা দেয় না। অনেক কিছুই হয়তো তাদের পছন্দ হয় না, তবে জানে এ নিয়ে রাতের ঘুম হারাম করার কোনো মানেও নেই!

বাধা-বিপত্তিকে সাফল্যে পরিণত করো

জীবনে চলার পথে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, এর বিরুদ্ধে কীভাবে সাড়া দেবো সেটি আমাদের বিষয়। যতবার বাধা আসবে, এটিকে সাফল্যে পরিণত করার সুযোগ কিন্তু আমাদের রয়েছে। ব্রাড লেমলি *প্যারেড* পত্রিকায় এক কোটিপতির উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন, 'তোমার জীবনে যা ঘটছে তা মুখ্য নয়, তুমি কী করছো সেটাই মুখ্য।'

এই কোটিপতি অর্থাৎ ডব্লিউ মিচেল একজন সেলফ-মেড মিলিওনেয়ার, সাবেক মেয়র, রিভার র‍্যাফটার এবং স্কাই-ডাইভার। এবং এসবই তিনি অর্জন করেছেন দুর্ঘটনার পরে।

মিচেলকে দেখলে তোমাদের বিশ্বাস হবে না, এ লোকটি এতো কিছু পারেন। দুর্ঘটনায় তাঁর চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে নানান চামড়া লাগানো হয়েছে। দুই হাতের আঙুলই বেশ কয়েকটি কাটা পড়েছে, তিনি পঙ্গু বলে হাঁটাচলাও করতে পারেন না। বাইক চালানোর সময় একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনি মারাত্মক আহত হন। পেট্রোল বিস্ফোরণে তাঁর শরীরের ৬৫ শতাংশ পুড়ে যায়। তবে কাছের পার্কের এক লোক একটি ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নিভিয়ে মিচেলের জীবন বাঁচান।

তারপর থেকে মিচেলের মুখখানা পোড়া, আঙুল পুড়ে বাঁকা হয়ে গেছে, পায়ের মাংসের জায়গায় দগদগে ঘা। অ্যাক্সিডেন্টের পরে তাঁর বীভৎস চেহারা দেখে অনেকেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তিনি দুই সপ্তাহ অচেতন ছিলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে পান। এ অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ১৯ জুন।

দুর্ঘটনা পরবর্তী চারমাসে মিচেলকে ১৩ বার রক্ত দেয়া হয়, ১৬ বার স্ক্রিন গ্রাফট অপারেশন করাসহ নানান সার্জারী করা হয়। চার বছর রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে কাটানোর পরে, নতুন পঙ্গু জীবন যখন মেনে নিয়েছেন মিচেল, ওই সময় ঘটে যায় এক অভাবনীয় ঘটনা।

হাসপাতালের জিমনেশিয়ামে উনিশ বছরের এক তরুণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এ ছেলেটি ছিল পর্বতারোহী। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়। সে স্কি-ও করতো। পঙ্গু হওয়ার পরে সে ভাবতো তার জীবন শেষ। মিচেল এই তরুণের কাছে গিয়ে বলেন, 'আমার জীবনে দুর্ঘটনা ঘটার আগে

১০,০০০ জিনিস ছিল, যা আমি করতে পারতাম। এখন আছে ৯,০০০। আমি আমার বাকি জীবন ১০০০ কাজ নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি কিন্তু আমি ৯০০০ কাজ করবো সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মিচেলের চলার পাথেয় ছিল দুটি। প্রথমত তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং সাহস পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত তাঁর ছিল ব্যক্তিগত একটি দর্শন, যা তিনি শিখেছেন বিভিন্ন সূত্র থেকে।

আমাদের অনেকের জীবনের বাধা-বিপত্তি হয়তো মিচেলের মতো এতো ভয়ংকর নয়। তবে তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে পারো, পরীক্ষায় ফেল করতে পারো, কেউ তোমাকে ধরে পেটাতে পারে, খুব অসুস্থ হয়ে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করি তুমি প্রো-এ্যাকটিভ হবে এবং এসব সমস্যা পাত্তা দেবে না।

যৌন নির্যাতনকে ঠেলে দাঁড়াও

মানব জীবনের যত বাধাবিপত্তি আছে, তার অন্যতম হলো যৌন নির্যাতন। আমি সেই সকালটির কথা কোনোদিন ভুলবো না, যেদিন একদল কিশোরী বাচ্চা বয়সে তাদের যৌন নিপীড়ন বা অবমাননার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল। এদেরকে শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবে অবমাননা করা হয়েছিল।

হিদারের মুখ থেকে তার গল্পটি শোনা যাক:

আমি চৌদ্দ বছর বয়সে যৌন অবমাননার শিকার হই। তখন একটি মেলায় গিয়েছিলাম। স্কুলের একটি ছেলে এসে আমাকে বলে, 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আমার সঙ্গে একটু আসো।' ও আমার বন্ধু ছিল বলে ওকে একটুও সন্দেহ করিনি। আর আমার সঙ্গে ও সবসময় ভালো ব্যবহার করতো। ও আমাকে অনেকখানি পথ হাঁটিয়ে নিয়ে স্কুলের খেলার মাঠে চলে আসে। ওখানে নিয়ে সে আমাকে ধর্ষণ করে।

ও আমাকে বলছিল, 'এ কথা তুমি কাউকে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া তুমি তো এরকম কিছুই চেয়েছিলে।' সে আরও বলে, এ ঘটনা আমার বাবা-মা জানতে পারলে লজ্জায় তাদের মাথা কাটা যাবে। আমি ঘটনাটি প্রায় দুই বছর গোপন রেখেছিলাম।

অবশেষে একদিন একটি হেল্প সেশনে আমি যাই। ওখানে মেয়েরা তাদের জীবন কাহিনী বলছিল। একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার কাহিনী শোনায়, যা আমার সঙ্গে একদম মিলে যায়। ছেলেটির নাম বলে সে। ওই একই ছেলে আমাকেও ধর্ষণ করেছিল। আমি তখন কাঁদতে শুরু করি। জানা যায় ছ'টি মেয়ে

ওই ছেলেটির কাছে ধর্ষিতা হয়েছে।

হিদার এখন তার মানসিক বিপর্যয় অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে। সে একটি টিনেজ দলের সদস্য, যাদের কাজ যৌন অবমাননার শিকার কিশোরীদের সাহায্য করা। এ দলটির সদস্য হতে পেরে নিজের মধ্যে নতুন শক্তি ফিরে পেয়েছে হিদার।

কেউ যদি তোমাকে যৌন অবমাননা করে সেটি তোমার দোষ নয়। আর সত্য কথা অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে। এসব ঘটনা গোপন রেখো না। কারও সঙ্গে শেয়ার করলে তোমার সমস্যাটি অর্ধেক করে ফেলতে পারবে। কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করবে, অথবা হেল্প সেশনে যাবে, কিংবা কোনো পেশাদার থেরাপিস্টের কাছে। প্রথমে যার সঙ্গে ঘটনাটি শেয়ার করলে তার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেলে হতাশ হয়ো না—এমন কাউকে খুঁজে বের করো, যে তোমার সমস্যাটি বুঝতে পারবে। প্রো-এ্যাকটিভ হও। এজন্য যা যা প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা নাও। এ বোঝা বইবার কোনো দরকার নেই।

একজন পরিবর্তনশীল প্রতিনিধি হও

একবার একদল কিশোর-কিশোরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, *তোমাদের রোল মডেল কে?* এক মেয়ে বললো তার মায়ের কথা। আরেকজন তার ভাইয়ের নাম উল্লেখ করলো। এভাবেই অনেকেই যে যার রোল মডেলের কথা বললো। একজনকে নিশ্চুপ দেখে জানতে চাইলাম, সে কাকে সবচেয়ে পছন্দ করে। ছেলেটি শান্ত গলায় জবাব দিল 'আমার কোনো রোল মডেল নেই'। রোল মডেল থাকতেই হবে এসবে সে বিশ্বাসী নয়। অনেক টিনেজারদের ক্ষেত্রেই এরকমটি দেখা যায়। তারা এমন বিশৃঙ্খল পরিবার থেকে আসে, যেখানে কাউকে রোল মডেল ভাবার অবকাশ নেই।

উদ্বেগের বিষয় যৌন নির্যাতন, মদ্যপানের অভ্যাস ইত্যাদি বদ গুণগুলো বাবা-মার কাছ থেকেই অনেক সময় তাদের সন্তানরা পেয়ে থাকে। ফলে অস্বাভাবিক পরিবারের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায় সমাজে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে ছোটবেলায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, বড় হয়ে সে-ও কারও উপর যৌন নির্যাতন করে শোধ তুলতে চায়। কখনও কখনও এরকম সমস্যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে।

তবে এ বৃত্তটি থামানো সম্ভব। যদি তুমি প্রো-এ্যাকটিভ হও তাহলে এ বদভ্যাস দূর করতে পারবে। তুমি হতে পারবে পরিবর্তনশীল প্রতিনিধি। তুমি তোমার সন্তানের জন্য, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য গড়ে তুলতে পারবে সু-অভ্যাস।

হিলডা নামে এক নাছোড়বান্দা কিশোরী আমাকে তার গল্প বলেছিল, কীভাবে সে তার 'পরিবারে পরিবর্তনশীল প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করেছিল। তার বাড়িতে কেউ পড়াশোনার ধার ধারতো না।

হিলডা বলেছে, 'আমার মা কারখানায় সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করতেন। খুব কম বেতন পেতেন। বাবাও অতি স্বল্প বেতনের একটি কাজ করতেন। দু'জনের মধ্যে প্রায়ই টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া হতো। তাঁরা টেনশনে থাকতেন কীভাবে বাড়ি ভাড়া শোধ করবেন? আমার বাবা-মা পনেরো বছর বয়সে স্কুলের পাট চুকিয়ে ফেলেন।'

বাবা ইংরেজি পারতেন না বলে হিলডাকে পড়াশোনায় কোনো সাহায্য করা সম্ভব হতো না। ফলে বেচারীর খুব কষ্ট হতো।

হিলডা যখন সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রী, ওই সময় তার বাবা-মা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মেক্সিকো চলে যান। হিলডা শিগ্গি বুঝতে পারে এখানে পড়ালেখার অবকাশ তার জন্য খুবই কম। সে বাবা-মাকে অনুরোধ করে আমেরিকায় তার খালার বাড়িতে যেতে চায় পড়াশোনার জন্য। পরবর্তী কয়েক বছর স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে হিলডাকে।

'আমার খালাতো বোনদের সঙ্গে একটি রুমে গাদাগাদি করে বসতে হয়েছে আমাকে,' বলেছে সে। 'বিছানায় ডাবলিং করতে হতো এবং কাজ করতাম আমি রুম ভাড়া ও স্কুলের বেতন পরিশোধের জন্য। তবু পড়াশোনাটা যে চালিয়ে যেতে পারছিলাম সেটাই ভাগ্য।

'অল্প বয়সেই আমার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু আমি স্কুল ছাড়িনি এবং পড়ালেখা শেষ করার জন্য কাজও চালিয়ে গেছি। আমার বাবা বলতেন, আমাদের পরিবারের কেউ কোনোদিন পেশাজীবী হতে পারবে না। আমি তাঁর কথা ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছি।'

হিলডা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়েছে। সে চায় তার বাচ্চারাও পড়ালেখা করে মানুষ হোক। সে তার বাচ্চাকে ইংরেজি এবং স্প্যানিশ শেখাচ্ছে। বলেছে, 'আমি আর ছেলের পড়াশোনার জন্য টাকা জমাচ্ছি। একদিন যখন তার হোমওয়ার্কে সাহায্যের প্রয়োজন হবে, আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো।'

শেন নামে ষোল বছরের এক কিশোরের সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম আমি। সে-ও তার পরিবারের পরিবর্তনশীল প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছে। শেন এক মফস্বলে বাস করতো। বাবা-মা একসঙ্গে থাকলেও নিত্যদিন ঝগড়াঝাটি ছিল তাদের সঙ্গী। তার বাবা লরী চালাতো এবং বাড়িতে রাতের বেলা ফিরতো না।

মা তার বারো বছরের ছোট বোনের সঙ্গে গাঁজা টানতো। বড় ভাই স্কুল ছেড়েছিল অনেক আগেই। এক পর্যায়ে শেন সব আশা ভরসা হারিয়ে ফেলে।

সে যখন ভাবছে তার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, ওই সময় স্কুলে ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট ক্লাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে শেন। দেখতে পায় নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ তার রয়েছে এবং নিজের জন্য ভবিষ্যতও গড়ে তুলতে পারবে।

শেনরা যে ফ্লাটে বাস করতো তার মালিক ছিলেন তার দাদু। দোতলা'র একটি কামরা সৌভাগ্যবসত ভাড়া পেয়ে যায় শেন মাসিক ১০০ পাউন্ডে। সে ডালাসে চলে যায়। তখন তার একটি নিজস্ব আশ্রয়স্থল হয়েছে এবং নিচের ফ্লোরে যা কিছুই ঘটুক তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারছে।

শেন বলেছে, 'এখন আমার জন্য জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। আমি আগের চেয়ে ভালো আছি। নিজেকে সম্মান করতে পারছি। আমার পরিবারের কারোরই কারও প্রতি কোনো সম্মানবোধ নেই। আমার পরিবারের কেউ কোনোদিন কলেজে যায়নি। কিন্তু আমি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সুযোগ পেয়েছি। আমি এখন যা করছি সবই আমার ভবিষ্যতের জন্য। আমার ভবিষ্যৎ হবে ভিন্নরকম। আমি জানি আমি আমার বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে বসে গাঁজা খাবো না।'

তোমাকে যা কিছুই চাপা দিয়ে রাখুক না কেন, তা ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা তোমার রয়েছে। তুমি যতই বিপাকে পড়ো না কেন, তুমিও হতে পারবে পরিবর্তনশীল প্রতিনিধি এবং নিজের জন্য একটি নতুন জীবন সৃষ্টি করতে পারবে।

তুমিও পারবে

প্রো-অ্যাকটিভ হওয়ার অর্থ দুটো। প্রথমত, তুমি তোমার জীবনের দায়িত্ব নিচ্ছো। দ্বিতীয়ত, তোমার রয়েছে 'পারবো' ভাবার দৃষ্টিভঙ্গি।

'পারবো' যারা ভাবে	**'পারবো না' যারা ভাবে**
যা করতে পারবে তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে	অপেক্ষা করে তাদের জীবন অলৌকিক কিছু ঘটবে সে জন্য।
সমাধান এবং বিকল্পের কথা ভাবে	বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করে
কাজে নেমে যায়	পরামর্শ বা ইংগিতের জন্য অপেক্ষা করে

যদি তুমি ভাবো পারবে এবং তুমি সৃষ্টিশীল ও নাছোড়বান্দা, তোমার চিন্তাতেই নেই আসলে তুমি কী করে ফেলতে পারবে।

জীবনের লক্ষ্যে পৌছাতে হলে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তোমাকে কেউ কিছু করতে বলছে না বলে যদি মন খারাপ করে বসে থাকো, তাহলে চলবে না। গোমরামুখো হয়ে না থেকে নেমে পড়ো কাজে। লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো। তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারো কী করা যায়?

তোমার কোলের মধ্যে কাজ বা চাকরি চলে আসবে এমনটি ভেবো না। কাজের পেছনে ধাওয়া করো। তোমার সিভি পাঠিয়ে দাও, ভলান্টিয়ার হিসেবে কোথাও ফ্রি কাজও করে দিতে পারো।'

কোনো দোকানে যদি দেখো সহকারী দরকার, দোকানী তোমার খোঁজ করবে, সেই অপেক্ষায় না থেকে নিজেই তার কাছে চলে যাও।

যারা পারবে তাদেরকে হতে হয় সাহসী, নাছোড়বান্দা এবং স্মার্ট। পিয়া'র কথাই ধরো। সে আমার সহকর্মী ছিল। যদিও গল্পটি অনেক আগের। কিন্তু পিয়া'র এ অভিজ্ঞতা তোমাদের কাজে লাগতে পারে।

আমি তখন ইউরোপের একটি বড় শহরের এক তরুণী সাংবাদিক। ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালে ফুলটাইম রিপোর্টার হিসেবে কাজ করি। আমি ছিলাম অনভিজ্ঞ এবং সবসময় এ কথা ভেবে নার্ভাস থাকতাম, বাঘা বাঘা পুরুষ সাংবাদিকদের তুলনায় আমি কিছুই করতে পারবো না। ওই সময় বিটলস দল আমাদের শহরে আসছিলেন এবং বিস্মিত হয়ে জানলাম, আমাকে তাঁদের ওপর স্টোরি করতে হবে। (আমার সম্পাদকের বোধহয় কোনো ধারণা ছিল না তাঁরা কতো বিরাট!) বিটলসরা ওইসময় ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যান্ডদল ছিলেন। শত শত মেয়ে তাঁদেরকে সামনা সামনি একনজর দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যেত। আর আমি কি-না ওই মানুষগুলোর সংবাদ সম্মেলন কভার করবো!

সংবাদ সম্মেলনটি দারুণ হয়েছিল। আমি ওখানে যেতে পেরে যারপরনাই উল্লসিত। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, সবার গল্প একইরকম হবে। আমি চাইছিলাম ভিন্ন কিছু লিখতে, যা পত্রিকার প্রথম পাতায় স্থান পাবার যোগ্য। আর সে সুযোগটি আমি হারাতে চাইনি। সংবাদ সম্মেলন শেষে অভিজ্ঞ সাংবাদিকরা একে একে সবাই চলে গেলেন যে যার রিপোর্ট লিখতে, বিটলসরা ফিরে গেলেন তাঁদের রুমে। আমি কোথাও গেলাম না। আমার মতলব এই মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা করা। এবং নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে ছিল না।

আমি হোটেল লবিতে গেলাম। হাউস ফোন তুলে ডায়াল করলাম

পেন্থহাউসে। অনুমান করেছিলাম ওটাই হবে তাঁদের আস্তানা। ফোন ধরলেন তাঁদের ম্যানেজার। 'আমি পিয়া জেনসেন বলছি ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল থেকে। আমি একটু বিটলসদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই।' আত্মবিশ্বাসের সাথে কথাগুলো বললাম। (আমার হারাবার কী আছে?)'

আমাকে অবাক করে দিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'চলে আসুন।'

আমি যেন লটারির টিকিট জিতে গেলাম। কাঁপতে কাঁপতে ঢুকলাম এলিভেটরে এবং হোটেলের রয়াল সুইটে চলে এলাম। বিশাল পেন্থহাউস—গোটা একটা ফ্লোর জুড়ে। ওখানে সকলে বসেছিলেন—রিঙ্গো, পল, জন এবং জর্জ। আমি আমার অনভিজ্ঞতা এবং নার্ভাসনেসকে গিলে ফেলে বিশ্বমানের সাংবাদিকের মতো আচরণের চেষ্টা করলাম।

পরবর্তী দুটো ঘণ্টা তাদের সঙ্গে কাটলো হাসি-ঠাট্টা-আনন্দে। তাদের কথা শুনলাম, লিখলাম। আমার জীবনের সেরা একটি সময় কেটে গেল। তাঁরা আমার সঙ্গে অত্যন্ত মার্জিত আচরণ করছিলেন এবং তাঁদের পূর্ণ মনোযোগ আমার প্রতিই ছিল।

পরদিন সকালে আমার স্টোরিটি দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি পত্রিকার ফ্রন্ট পেজে ছাপা হয়। এবং বিটলসদের প্রত্যেকের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তা বিশ্বের বেশিরভাগ কাগজে পরবর্তী কয়েকদিনে প্রকাশিত হয়েছে। এরপরে রোলিংস্টোন দল যখন শহরে এসেছিল, তখন কাকে তাদের ইন্টারভিউ নিতে পাঠানো হয়েছিল, জানেন? আমাকে, এক তরুণ, অনভিজ্ঞ নারী সাংবাদিককে। আমি শীঘ্রি বুঝতে পারি স্রেফ নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকলে আমি যে কোনো কাজ উদ্ধার করতে পারি। আমার মনে একটা হুক এঁটে যায় এবং আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, যে কোনো কিছুই করা সম্ভব। বিটলসদের এ ইন্টারভিউ আমার সাংবাদিকতার ক্যারিয়ারটাকেই ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

বিশ্বখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন, 'লোকে সবসময় তাদের পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে নালিশ জানায়। আমি পারিপার্শ্বিকতায় বিশ্বাসী নই। আমি পরিবেশ তৈরিতে বিশ্বাসী।'

ছোট ছোট পদক্ষেপ

১) কেউ তোমার সঙ্গে বৈরি আচরণ করলে তুমি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।

২) তুমি কী বলছো ভালো করে খেয়াল করবে। গুণে নিও কতোবার রি-এ্যাকটিভ ভাষা ব্যবহার করেছো।

৩) সেই কাজটি আজই সেরে ফেলো, যেটি সবসময় করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু করতে পারনি।

৪) একটা পোস্ট-ইন নোট লিখে তা আয়নায় সাঁটিয়ে রাখো কিংবা তোমার ডায়েরিতে রাখো। নোটটি হতে পারে এরকম, আমি আর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবো না।

৫) পার্টিতে দেয়ালের কোনা ঘেষে বসবে না এবং অপেক্ষা করবে না যে, কেউ তোমাকে দেখে তারপর হুল্লোড়ে ডেকে নেবে। নিজেই এগিয়ে গিয়ে, পরিচয় দিয়ে হুল্লোড়ে মেতে ওঠো।

৬) পরেরবার পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে না পারলে মন খারাপ করবে না। টিচারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করো। দেখো, কী শিখতে পারো।

৭) বন্ধুবান্ধব বা বাবা-মা'র সঙ্গে ঝগড়া হলে তুমিই আগ বেড়ে ক্ষমা চাইবে।

৮) নিজের মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করো, যা তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছো না। এখন সেটা ঝেড়ে ফেলে দাও মন থেকে।

৯) কারও সঙ্গে করিডোরে ধাক্কা লেগে গেলেও ঝগড়া করতে যেয়ো না। নিজেই এগিয়ে সরি বলো, এতে অন্যরা তোমার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবে।

১০) নিজের আত্মসচেতনতাকে জিজ্ঞেস করো 'আমার সবচেয়ে বাজে অভ্যাস কী?' তারপর এ অভ্যাসটা দূর করার চেষ্টা করো।

অভ্যাস-২

শুরুটা করো প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

নিজের নিয়তি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করো
নতুবা অন্য কেউ করবে



তোমাকে একটি জিগশ পাযল সাজাতে বলা হয়েছে। তুমি আগেও এসব ধাঁধার রহস্য সমাধান করেছো বলে এ কাজটি করতে উত্তেজিত বোধ করছো। তুমি পাযলের ১০০০ টুকরোর পুরোটাই বড় একখানা টেবিলে ঢেলে দিলে। তারপর বাক্সের ঢাকনা তুলে দেখলে ওখানে কী রাখবে। কিন্তু দেখলে ভেতরে কোনো ছবি-টবি নেই। একদম খালি! কিন্তু পাযলটা কেমন হবে, না দেখে কিভাবে ধাঁধাটা সাজাবে? তোমার কাছে কোনো ক্লুই নেই শুরু করার জন্য।

তখন নিজের জীবন নিয়ে এবং তোমার ১০০০টি টুকরো নিয়ে চিন্তা করো। তুমি আজ থেকে এক বছর পরে কী হতে চাও, সে বিষয়ে কোনো পরিষ্কার ধারণা আছে তোমার? কিংবা পাঁচ বছর পরে? নাকি তোমার কাছে কোনো ক্লু-ই নেই?

২নং অভ্যাসের শুরু মনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এর অর্থ তুমি জীবন নিয়ে কোন দিকে ধাবিত হতে চাও, তার একটি পরিস্কার চিত্র অংকন করো। তার মানে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তোমার মূল্যবোধগুলো কী এবং লক্ষ্যগুলো কী?

১নং অভ্যাস বলছে, তুমি তোমার জীবনের চালক, যাত্রী নও। ২নং অভ্যাস বলছে, যেহেতু তুমি চালক কাজেই ঠিক করো কোথায় যাবে এবং সেখানকার একটি মানচিত্র তৈরি করো।

'এক মিনিট, শন,' তুমি বলতে পারো। 'আমি জানি না আমার মনের চিন্তার শেষ কোথায়, জানি না বড় হয়ে আমি কী হতে চাইছি?'

আমি কিন্তু বলছি না তোমার ভবিষ্যতের প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে, যেমন তোমার ক্যারিয়ার বা কাকে বিয়ে করবে এসব। আমি বলছি, আজকের পরে কী ভাববে এবং সিদ্ধান্ত নেবে কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চাও তোমার জীবন? কাজেই যে পদক্ষেপই নাও না কেন সেটি যেন সঠিক হয়।

শুরুটা করো প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

তুমি হয়তো কথাটি বুঝতে পারনি। তবে সবসময় কাজটি করে আসছো। তুমি কোনো বাড়ি তৈরির আগে তো তার একটা নকশা করো। কেক বানাবার আগে রেসিপি পড়ো। রচনা লেখার আগে আউটলাইন তৈরি করো। এটাই জীবনের অংশ।

প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যাক তোমার কল্পনাশক্তির সাহায্যে। এমন একটা নির্জন জায়গা খুঁজে বের করো, যেখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।

এখন মন থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দাও। স্কুল, বন্ধ-বান্ধব, পরিবার কোনো কিছু নিয়েই ভাববে না। শুধু আমার প্রতি মনোযোগ দাও, গভীর দম নাও, খুলে দাও মন।

তোমার মনের চোখে কাউকে কল্পনা করো, যে আধা ব্লক দূর থেকে হেঁটে আসছে তোমার দিকে। প্রথমে তুমি বুঝতে পারছো না কে সে? তবে লোকটি যখন আরও কাছিয়ে এলো, হঠাৎ বুঝতে পারলে সে আর কেউ নয়, তুমি স্বয়ং। তবে এ আজকের তুমি নও। আজ থেকে এক বছর পরের তুমি।

এখন গভীরভাবে চিন্তা করো।
তুমি গত বছরে তোমার জীবন নিয়ে কী করেছো?
তুমি তোমার ভেতরে কীরকম অনুভব করছো?
তুমি দেখতে কেমন?
তোমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী কী?

এখন তুমি বাস্তবে ফিরে আসতে পারো। তুমি হয়তো এ এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে নিজের গভীর সত্তাকে স্পর্শ করতে পেরেছো। বুঝতে পেরেছো তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কী এবং আগামী বছরে কী করতে চাও? একেই বলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মনের শুরু।

একটি অতি ভালো ছাত্র তার অভিজ্ঞতা থেকে যা বলছে, তোমার হয়তো কাজে লাগতে পারে।

আমি জীবনে কোনো কিছু পরিকল্পনা করে করিনি। যেমন মন চেয়েছে তেমন করেছি। একজনের শুরুর জন্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত, এটি আমার মাথাতেই আসেনি। তবে বিষয়টি শিখবার অভিজ্ঞতাই ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। কারণ হঠাৎ আবিষ্কার করি, আমি গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছি। এখন আমি আমার পড়ালেখা নিয়ে শুধু প্ল্যানই করছি না, আমার বাচ্চাকাচ্চাদের কীভাবে বড় করবো তা-ও ভাবছি। ভাবছি কীভাবে আমার পরিবারকে শেখাবো, আমাদের বাড়িটি কীরকম হবে ইত্যাদি। এখন আমি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছি— আর হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি না।

মন নিয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটা জরুরি কেন? এর দুটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত তুমি রয়েছো তোমার জীবনের জটিল ক্রস রোডে, এবং তুমি তখন যে রাস্তায় যাবে, সেটি তোমার ওপর সারাজীবনের জন্য প্রভাব রাখতে পারে। দ্বিতীয় হলো এখনই যদি নিজের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা না করো, অন্য কেউ সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করবে।

জীবনের ক্রস রোড

জীবনের ক্রস রোড মানে হলো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের কাল। তুমি এখনও বয়সে তরুণ। তুমি মুক্ত। তোমার সামনে পড়ে রয়েছে গোটা জীবন। জীবনের ক্রস রোডে দাঁড়িয়ে আছো তুমি। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন্ রাস্তায় যাবে?

তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাও?
জীবনের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?
তুমি কি ওই ফুটবল দলে থাকতে চাও?
কী ধরনের বন্ধু তুমি চাও?
কোনো দলে যোগ দেবে?
কার সঙ্গে ডেট করবে?
বিয়ের আগে সেক্স করবে কী না?
তুমি কি সিগারেট, মদ পান করো, নেশা করো?
কী ধরনের মূল্যবোধে তুমি বিশ্বাসী?
পরিবারের সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক তুমি চাইছো?
তুমি ওপেন বন্ধুত্বে বিশ্বাসী কি না?

তুমি আজ যে পথ বেছে নেবে, সেটি তোমাকে চিরকালের জন্য গড়ে দিতে পারে। তরুণ বয়সে আমরা কতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, এ ভাবনাটি একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তেমনই ভীতিকরও বটে। কিন্তু জীবন তো এরকমই। আট ফুট লম্বা একটি রশির কথা চিন্তা করো, যেটি বিছিয়ে আছে তোমার সামনে। প্রতিটি ফুট রশি তোমার জীবনের একেকটি বছর। কৈশোরকালের ব্যাপ্তি সাত বছর, তবে এ সাত বছরের প্রভাবই থাকতে পারে একষট্টি বছর পর্যন্ত, ভালো অথবা মন্দভাবে।

বন্ধু

বন্ধুরা তোমার ওপর অনেক প্রভাব রাখতে পারে। যদিও বন্ধু নির্বাচনে অনেক সময় আমাদের ভুল হয়ে যায়। তবে ভুল বন্ধু বাছাই করার চেয়ে

একেবারে বন্ধু না থাকা অনেক ভালো। ভুল বন্ধুরা তোমাকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, সে নতুন বন্ধুদের জন্য পুরানো বন্ধুদের ত্যাগ করেছিল। তার গল্পটি মনোযোগের সাথে শোনা যাক:

স্কুলে আমার শেষ বর্ষের আগের সামারে জ্যাক নামে আমার খুব ভালো এক বন্ধু ছিল। স্কুল শুরু হওয়ার মাসখানেক আগে সে ইউরোপ চলে যায় এবং ফিরে আসে ভাং বা সিদ্ধি নামে এক শক্তিশালী মাদক নিয়ে। আমরা আগে কখনও মাদকের স্বাদ গ্রহণ করিনি। সে তার নতুন বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলা একটি দলে আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল এই নিষিদ্ধ বস্তুটির স্বাদ নিতে। সে '২৪ ক্লাব' নামে একটি ক্লাবও চালু করে, যেখানে একটি বৃত্তের মধ্যে বসে তোমাকে লম্বা লম্বা চব্বিশটি বিয়ারের বোতল শেষ করতে হবে। জানতাম এসবের কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং শেষ পর্যন্ত এগুলো ধ্বংস ডেকে আনবে, যদি নিয়মিত সে মাদক সেবন চালিয়ে যায়। তবে প্রাইমারি স্কুল থেকে ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল এবং আমার আর তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু না থাকায় আমি ওর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাইনি, আবার একই সঙ্গে জ্যাকের ধ্বংস দেখাতো আমার কাম্য ছিল না।

কিন্তু একসময় বুঝতে পারি, জ্যাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা আমার জন্য সত্যি ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে। তাই স্কুলের শেষ বছরে আমি নতুন বন্ধু গড়ে তুলতে শুরু করি। প্রথম প্রথম ব্যাপারটি কেমন অদ্ভুত লাগতো এবং একাকী থাকতে নিজেকে হারা মনে হতো। তবে কিছুদিনের মধ্যে আমি আমার মন মানসিকতার কয়েকজনের সঙ্গে নতুন বন্ধুত্ব করে ফেলি এবং আমরা অনেক মজা করতে থাকি।

আমার পুরানো বন্ধু জ্যাক পুরোপুরি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, ও আর পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। একদিন মাদক নিয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে সুইমিং পুলে ডুবে মারা যায় সে। আমার খুব খারাপ লেগেছিল, তবে নিজের কাছেই কৃতজ্ঞ ছিলাম এ ভেবে, আমি নতুন বন্ধু গড়ে তোলার সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পেরেছিলাম নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

ভালো বন্ধু গড়ে তুলতে হলে বয়স কোনো সমস্যা নয়। তোমার চেয়ে বেশি বয়সীদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করতে পারো। আমার এক পরিচিত লোকের স্কুল জীবনে খুব কম বন্ধু-বান্ধব ছিল, তবে তার এক দাদু ছিলেন, যিনি ওর সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন। এতে সেই লোকটির বন্ধুত্বের শূন্য জায়গাটা ভরে গিয়েছিল। আসল কথা হলো, বন্ধুত্ব যার সঙ্গেই করো না কেন, ভেবেচিন্তে করবে। কারণ তোমার ভবিষ্যতের অনেকটাই নির্ভর করছে তুমি যাদের সঙ্গে চলাফেরা করছো তাদের ওপর।

স্কুল

তুমি কোন স্কুলে পড়ছো বা স্কুলে কী শিখছো তা কিন্তু তোমার ভবিষ্যতকে বিভিন্নভাবেই গড়ে তুলবে। এ প্রসঙ্গে জেনের অভিজ্ঞতার কথা শোনা যাক:

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় আমি ইতিহাসে AS লেভেল নেব বলে ঠিক করি।

স্কুল জীবনের গোটা সময় শিক্ষক হোমওয়ার্ক দিয়ে আমাদের মাথা নষ্ট করে দিতেন। এতো এতো বাড়ির কাজ করা সত্যি কঠিন ছিলো কিন্তু আমি সংকল্পবদ্ধ ছিলাম, ক্লাসে ভাল করার পাশাপাশি পরীক্ষাতেও ভালো ফল করবো। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টে পূর্ণ মনোযোগ ও পরিশ্রম দেয়া সম্ভব হয় আমার পক্ষে।

আমাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো ছিল সময়খেকো।

শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রকে গৃহযুদ্ধের ওপর তথ্যচিত্র দেখিয়ে প্রতিটি সেগমেন্টের ওপর রচনা লিখতে বলতেন। এসব ডকুমেন্টারি চলতো দশদিন ধরে এবং প্রতিটি সেগমেন্ট ছিল দুই ঘণ্টার। আমি পড়ালেখায় প্রচুর সময় দিতাম বলে ডকুমেন্টারি দেখার সময় করে ওঠা কষ্টসাধ্য হলেও কাজটা করতাম। আমি লেখা জমা দেয়ার পরে আবিষ্কার করি, মাত্র অল্প কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী গোটা সিরিজ দেখেছে।

অবশেষে চলে আসে ফাইনাল পরীক্ষার দিন। ছাত্র-ছাত্রীরা খুব নার্ভাস ছিল। পরিবেশ ছিল থমথমে। টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঘোষণা করেন, 'শুরু করো।' আমি গভীর একটি দম নিয়ে মালটিপল চয়েসের প্রথম সেকশনের সিলটি খুলে ফেলি। প্রতিটি প্রশ্ন দেখে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে চলছিল। আমি তো



এসব প্রশ্নের জবাব জানি! পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ার অনেক আগেই আমার লেখা শেষ হয়ে যায়।

তারপর আসে রচনা লেখার পালা। আমি রচনা বইয়ের সিল ভয়ে ভয়ে খুলে প্রশ্নের ওপর চোখ বুলাই দ্রুত। গৃহযুদ্ধ বিষয়ক একটি প্রশ্নের সহজেই জবাব দিয়েছিলাম। কারণ ডকুমেন্টারি দেখে এবং বই পড়ে এ ব্যাপারে আমার বেশ ভালোই জানা হয়ে গিয়েছিল। প্রশান্ত মনে সেদিন আমি পরীক্ষা শেষ করেছি।

বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে আমি পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারি—আমি ভালো মার্ক পেয়েই পাস করে গেছি!

নেতৃত্বে কে?

ভিশন বা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির আরেকটি কারণ হলো, তুমি এটি না করলে অন্য কেউ এটা তোমার জন্য বানিয়ে দেবে। বিজনেস এক্সিকিউটিভ জ্যাক ওয়েলচ বলেছেন, 'নিজের নিয়তি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করো নতুবা অন্য কেউ করবে।'

'কে করবে?' প্রশ্ন করতে পারো তুমি।

হয় তোমার বন্ধুরা, নতুবা বাবা-মা কিংবা মিডিয়া। তুমি কি তোমার বন্ধুদেরকে বলতে চাও তারা তোমার জন্য দাঁড়াবে? তোমার বাবা-মা হয়তো খুব ভালো কিন্তু তুমি কি চাও তাঁরা তোমার জীবনের নকশাটি এঁকে দিক? তাদের চিন্তা ভাবনা হয়তো তোমার সঙ্গে মিলবেই না।

তুমি হয়তো এখন ভাবছো, 'আমি ভবিষ্যত নিয়ে এতো এতো চিন্তা করতে চাই না। আমি এ মুহূর্তের জন্য বাঁচতে চাই এবং স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলতে চাই।'

আমি এ মুহূর্তের জন্য বাঁচতে চাইবার নীতিতে বিশ্বাসী। অবশ্যই আমাদেরকে বর্তমান মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে হবে। তবে স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলার ব্যাপারটি মেনে নিতে পারলাম না। স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকলে শেষে তুমি নিচের দিকে আছড়ে পড়বে, গা মাখামাখি হয়ে যাবে নোংরায়, জীবন হয়ে উঠবে নিরানন্দময়। সবাই যা করছে তুমি হয়তো তা-ই করবে, কিন্তু তোমার মনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয় তা সমর্থন করবে না। যে রাস্তা যে কোনোদিকে যায়, সেই জীবন আসলে কোনোদিকে যায় না।

নিজের মনে কোনো পরিকল্পনা না থাকলে যারা আমাদেরকে নেতৃত্ব দিতে চাইবে আমরা তাদের পেছনেই ছুটতে থাকবো। এতে আসলে বেশি দূর যাওয়া যায় না। একবার আমি রোড রেসে অংশ নিয়েছিলাম। অন্যান্য রানারদের সঙ্গে

অপেক্ষা করছিলাম কখন রেস শুরু হবে। কিন্তু স্টার্টিং লাইন আমাদের কারোরই জানা ছিল না। তারপর কয়েকজন রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে, যেন তারা জানে ওটাই স্টার্টিং লাইন। সবাই, আমিসহ, ওদের পেছন পেছন হাঁটতে থাকি। ভেবেছি সামনে যারা আছে তারা জানে তারা কোথায় যাচ্ছে। মাইলখানেক হাঁটার পরে হঠাৎ সবাই বুঝতে পারি আমরা একদল নির্বোধ মেষের মতো এমন একজনকে অনুসরণ করছি যে, বোকাটা জানেই না সে কোথায় যাচ্ছে? জানা গেল স্টার্টিং লাইন ছিল আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেটা।

কাজেই কখনও ভেবো না যে, পাল জানে তারা কোথায় যাচ্ছে। আসলে তারা কিছুই জানে না!

পার্সোনাল মিশন স্টেটমেন্ট

যদি মনে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি থাকে তাহলে তুমি কীভাবে কাজটা করো? এর সেরা রাস্তাটি আমি পেয়েছি একটি পার্সোনাল মিশন স্টেটমেন্ট লেখার মাঝ দিয়ে। পার্সোনাল মিশন স্টেটমেন্টকে অনেকটা ব্যক্তিগত মত বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এটি তোমার জীবনের ব্লুপ্রিন্ট। দেশ বা জাতির থাকে সংবিধান যা মিশন স্টেটমেন্টের ভূমিকা পালন করে। মাইক্রোসফট বা কোকা-কোলার মতো কোম্পানিদের থাকে মিশন স্টেটমেন্ট। তবে এরা মানুষের জন্য সেরাটা করে।

কাজেই তুমি কেন তোমার নিজের ব্যক্তিগত মিশন স্টেটমেন্ট লিখছো না? অনেক টিনেজারেরই তা আছে। বিভিন্ন ঢংয়ে তারা এসব লেখে। কারও স্টেটমেন্ট দীর্ঘ, কারওটা হ্রস্ব। কেউ লেখে কবিতার ঢংয়ে, কেউবা গানের মতো করে। কোনো কোনো টিনেজার আবার প্রিয় কোনো উক্তিকে মিশন স্টেটমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে। অন্যরা ছবি বা ফটোগ্রাফ দেয়।

নিচে কিছু মিশন স্টেটমেন্ট দেয়া হলো। এগুলো লিখেছে বেথ হেয়ার নামে এক কিশোরী।

সবার আগে আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবো।

পারিবারিক একতার শক্তিকে আমি ছোট করে দেখবো না।

আমি প্রকৃত একজন বন্ধুকে অবহেলা করবো না, তবে পাশাপাশি নিজের জন্যেও সময় রাখবো।

আমি সকল চ্যালেঞ্জ শুরু করবো আশা নিয়ে, সন্দেহ নয়।

আমি সবসময় ইতিবাচক সেলফ ইমেজ বজায় রাখবো, নিজের আত্মবিশ্বাস

মিশন স্টেটমেন্ট

* নিজের ব্যাপারে এবং আশপাশে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর বিষয়ে আত্মবিশ্বাস রাখো।
* সবার প্রতি দয়ালু, নম্র হও এবং সম্মান দেখাও।
* যেসব লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব সেইরকম লক্ষ্য স্থির করো।
* এসব লক্ষ্য থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয়ো না।
* মনে রেখো কোনোকিছুই সহজে পাওয়া যায় না।
* অন্য লোকদের ভিন্নতা মেনে নাও।
* প্রশ্ন করো।
* মনে রেখো কাউকে বদলাতে হলে আগে নিজেকেই বদলাতে হবে।
* কাজ করে দেখাও, মুখে শুধু বুলি দিয়ো না।
* যারা গরীব-দুঃখী তাদেরকে সাহায্য করো।
* বইয়ের সাতটি অভ্যাস প্রতিদিন পাঠ করবে।

এই মিশন স্টেটমেন্টটি প্রতিদিন করবে।

ধরে রাখবো এই ভেবে যে, আমার সমস্ত অভিপ্রায় শুরু হবে আত্মমূল্যায়ন থেকে।

অ্যাডাম সসনে আমার বইয়ের সাতটি অভ্যাস সম্পর্কে পরিচিত এবং সে নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনার ব্যাপারেও সচেতন। কাজেই তার তো মিশন স্টেটমেন্ট থাকবেই।

তো মিশন স্টেটমেন্ট তোমার জন্য কী করতে পারে? বহু কিছু। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি তোমার চোখ খুলে দিতে পারে, তোমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী এবং সেভাবে তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে।

আঠারো বছরের একটি মেয়ে একটি মিশন স্টেটমেন্ট লিখেছে, যেটি তার জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

আমার এক বয়ফ্রেন্ড ছিল। আমি তাকে সুখী করার জন্য সবকিছু করতে চাইতাম। তারপর একদিন স্বাভাবিকভাবেই সেক্সের বিষয়টি চলে এলো—আমি আসলে এটি করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আর এটা আমাকে সারাক্ষণ খোঁচাতো। আমার মনে হতো আমি এটির জন্য ঠিক প্রস্তুত নই এবং আমি সেক্স করতে চাই না—যদিও সবাই বলছিল 'করে ফেলো।'

তারপর একদিন আমি স্কুলে একটি পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট ক্লাসে অংশ নিই এবং সেখানে তারা আমাকে শেখায়, কীভাবে মিশন স্টেটমেন্ট লিখতে হয়।

আমি মিশন স্টেটমেন্ট লিখতে শুরু করি এবং লিখতেই থাকি। এর সঙ্গে নানান জিনিস যোগ করি। এটি আমাকে একটি দিক নির্দেশনা দেয় এবং আমার মনে হতে থাকে, আমি যা করছি তার একটি ব্যাখ্যা এবং পরিকল্পনা পেয়ে গেছি। এই মিশন স্টেটমেন্ট আমাকে আমার মানদণ্ডে লেগে থাকতে এবং যার জন্য আমি প্রস্তুত নই তা না করতে শিখিয়েছে।

পার্সোনাল মিশন স্টেটমেন্ট অনেক গাছের গভীর শিকড়সহ গণ্ড। এটি স্থিতিশীল এবং এটি কোথাও যাবে না। একই সঙ্গে এটি জীবন্ত এবং ক্রমশ আকারে বাড়ছে।

জীবনের সকল ঝড়ঝঞ্ঝায় টিকে থাকতে চাইলে গভীর শিকড়সহ একটি গাছের প্রয়োজন হবে তোমার। তুমি বোধহয় ইতিমধ্যে খেয়াল করেছো জীবন স্থিতিশীল নয়। বিষয়টি নিয়ে ভাবো। মানুষ বড় অস্থির প্রকৃতির। তোমার বয়ফ্রেন্ড এখন তোমাকে ভালোবাসে, আবার খানিক পরেই তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তুমি হয়তো কারও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু সেই বন্ধুটি আড়ালে তোমার নিন্দা করছে।

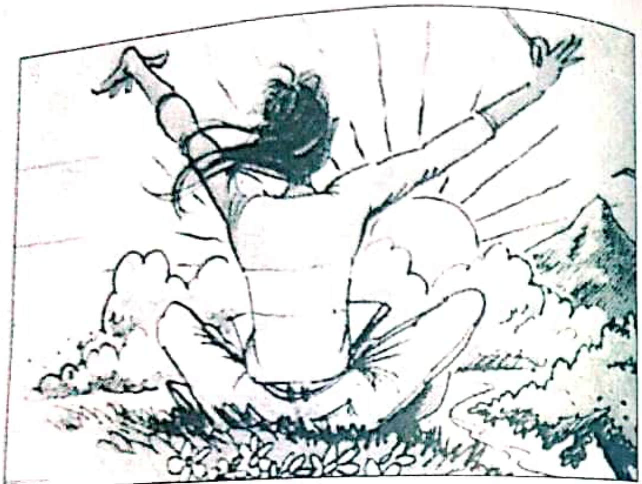
যেসব বিষয়গুলো তোমার নিয়ন্ত্রণসাধ্য নয় তা নিয়ে ভাবো। তোমাকে এগোতে হবে। তোমার সবকিছু যখন বদলে যাবে, তখন একটি পার্সোনাল মিশন স্টেটমেন্ট হতে পারে তোমার মাটির গভীরে প্রোথিত শিকড়, যা কখনও সরবে না। এরকম কোনো শক্ত কাণ্ড ধরে থাকতে পারলে তুমি তোমার পরিবর্তনগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবে।

তোমার প্রতিভার উন্মোচন করো

পার্সোনাল মিশন স্টেটমেন্ট বিকশিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, তুমি যে কাজটি ভালো পারো সেটিকে উন্মোচিত করা। আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে, সকলেরই কোনো না কোনো প্রতিভা রয়েছে। কেউ খুব ভালো গাইতে পারে। কেউ আঁকতে পারে ছবি অথবা সুবক্তা কিংবা গল্পকার, কবি।

একবার খুব সুন্দর একটি ভাস্কর্য তৈরির পরে মাইকেল এঞ্জেলোকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি কীভাবে কাজটি করলেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ভাস্কর্যটি গ্রানাইট পাথরে আদিকাল থেকে মুদ্রিতই ছিল, তিনি শুধু বাটাল দিয়ে ওটাকে মূর্ত করে তুলেছেন।

বিখ্যাত ইহুদি-অস্ট্রিয়ান মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রাঙ্কল, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী জার্মান ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন, তিনি শিখিয়েছেন আমরা আসলে



আমাদের প্রতিভা আবিষ্কার করি না, চিহ্নিত করি মাত্র। তুমি আসলে জানো তোমার কী প্রতিভা রয়েছে, শুধু এটিকে উন্মোচন করার অপেক্ষা।

আমি একবার নিজের প্রতিভা আবিষ্কার করে বড়ই পুলকিত হয়েছিলাম। সৃজনশীল লেখায় একবার মি. উইলিয়ামসের ক্লাসে আমি *'দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য ফিশ'* নামে একটি গল্প লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। এ গল্পটি ছেলেবেলায় বাবা আমাকে বলেছিলেন। তবে তিনি বলেননি যে, প্লটটি তিনি সরাসরি চুরি করেছেন নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *'দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সী'* থেকে। আমার লেখাটি ফেরত এলে আমি খুব শকড হই। কারণ ওতে শিক্ষকের মন্তব্য লেখা ছিল, 'বড্ড গতানুগতিক মনে হচ্ছে। হেমিংওয়ের *'ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সী'*র সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে।'

'এই হেমিংওয়েটা কে?' ভাবি আমি। 'সে কীভাবে আমার বাবার গল্প নকল করলো?' ইংরেজি ক্লাসে ওটা ছিল আমার বেচারা ধরনের শুরু।

আমি ইউনিভার্সিটিতে ওঠার পরে আবিষ্কার করি, আমার গল্প লেখার প্রতি দারুণ আবেগ রয়েছে। বিশ্বাস করো বা না-ই করো, আমি ইংরেজি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম। কিন্তু মি. উইলিয়ামস আমার সাফল্য দেখে যেতে পারেননি। তার আগেই তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেছেন।

দারুণ আবিষ্কার

১) একজন লোকের কথা চিন্তা করো, যিনি তোমার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। সেই মানুষটির মধ্যে কী গুণ রয়েছে যা তোমার নিজের মধ্যে কামনা করো?

২) আজ থেকে ২০ বছর পরে নিজেকে কল্পনা করো—তোমাকে বিখ্যাত সব ব্যক্তি ঘিরে আছেন। তাঁরা কারা এবং তুমি তখন কী করছো?

৩) দুটি আকাশ ছোঁয়া ভবনের মাঝখানে যদি ৬ ইঞ্চি চওড়া কোনো ইস্পাতের বীম রাখা হয়, তুমি তাহলে ওখান থেকে কী পারো করতে চাইবে? হাজার পাউন্ড ওজন? মিলিয়ন পাউন্ড? তোমার পোষা কোনো প্রাণী? তোমার ভাইকে? খ্যাতিকে? চিন্তা করে জবাব দাও...

৪) যদি কোনো বিখ্যাত লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার সুযোগ পাও, কী বই পড়বে?

৫) ১০টি জিনিসের তালিকা করো, যেগুলো তুমি করতে চাও। এটা হতে পারে নাচ, গান, পত্রিকা পাঠ, ছবি আঁকা, বই পড়া, দিবাস্বপ্ন দেখা... যে কোনো কিছু, যা তুমি করতে খুবই আগ্রহী।

৬) এমন একটি সময়ের কথা বলো, যখন তুমি খুব অণুপ্রাণিত হয়েছিলে।

৭) আজ থেকে পাঁচ বছর পরে তোমার স্থানীয় খবরের কাগজটি তোমাকে নিয়ে স্টোরি লিখতে চাইছে। তারা এ ব্যাপারে তিনজন লোকের ইন্টারভিউ করবে। তোমার বাবা, তোমার ভাই অথবা বোন এবং তোমার কোনো বন্ধু। তারা তোমার সম্পর্কে কী বলবে বলে প্রত্যাশা করো?

৮) এমন একটি কিছুর কথা ভাবো, যা তোমার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে... একটি গোলাপ, একটি গান, কোনো জন্তু...

কেন এটি তোমার প্রতিনিধিত্ব করছে?

৯) তুমি যদি বিখ্যাত কোনো মানুষের সঙ্গে একঘণ্টা কাটানোর সুযোগ পাও, তাহলে তিনি কে হবেন? ওই লোকটিকে কেন তুমি পছন্দ করবে? তুমি তাকে কী জিজ্ঞেস করবে?

১০) প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো প্রতিভা থাকে। তোমার নিচের প্রতিভাগুলোর কোনটি আছে? না থাকলে তালিকা বানাও।

* সৃজনশীল চিন্তা করার ক্ষমতা
* খেলাধুলা
* ম্যাকানিকাল



* আর্টিস্টিক
* লোকের সঙ্গে কাজ করতে পারার গুণ
* সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারঙ্গম
* সহজে অন্যকে মেনে নিতে পারা
* ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা বলতে পারা
* লেখালেখি
* নাচ
* গান
* রসের গল্প করা
* ভালো বক্তব্য দেওয়া, উপস্থাপনা ও আবৃত্তি করা

মিশন স্টেটমেন্ট দিয়ে শুরু করে দাও কাজ

তুমি দারুণ আবিষ্কারের পাট চুকিয়ে এসেছো, এখন মিশন স্টেটমেন্ট ডেভেলপ বা উন্নয়ন শুরুর জন্য প্রস্তুত হতে পারো। নিচে চারটে সহজ পদ্ধতির কথা লিখেছি, যা তোমাকে নিজের মিশন স্টেটমেন্ট লিখতে সাহায্য করবে। তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো এগুলোর কোনোটি তোমার সঙ্গে যায় কিনা।

পদ্ধতি-১ : উক্তি সংগ্রহ : তোমার প্রিয় উক্তিগুলোর গোটা পাঁচেক কাগজে লিখে নাও। এগুলো হবে তোমার মিশন স্টেটমেন্ট। কারও কারও জন্য এসব উক্তি দারুণ অনুপ্রেরণার কাজ করে।

পদ্ধতি-২ : ব্রেইন ডাম্প : তোমার মিশন নিয়ে পনেরো মিনিট লেখো। কী

বেরুচ্ছে কলমের ডগা দিয়ে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। যা লিখেছো তা সম্পাদনারও প্রয়োজন নেই। শুধু লিখতে থাকো এবং থামবে না। নিজের যত আইডিয়া আছে সব লিখে ফেলো কাগজে। কোথাও বেঁধে গেলে দারুণ আবিষ্কারের লেখাগুলোর কথা ভাবো। তাহলে তোমার কল্পনা শক্তি উদ্বুদ্ধ হবে। যখন তোমার মস্তিষ্ক যথেষ্ট পরিমানে বিশোধিত হবে, তখন আরও পনের মিনিট সময় নাও সম্পাদনার জন্য।

ত্রিশ মিনিটের মাথায় যে ফলাফল এলো, তা দিয়ে তুমি তোমার মিশন স্টেটমেন্টের একটা খসড়া মুসাবিদা পেয়ে গেলে। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ এটিকে রিভাইজ দাও, এতে যোগ করো, তোমাকে অনুপ্রাণিত করে তুলতে যা যা দরকার সব বিশদ লেখো।

পদ্ধতি-৩ : পশ্চাদপসরণ : গোটা একটি বিকেল হাতে নিয়ে এমন কোনো জায়গায় চলে যাও যেখানে একা সময় কাটানো সম্ভব। নিজের জীবন নিয়ে গভীরভাবে ভাবো, চিন্তা করো এ জীবন দিয়ে তুমি করতে চাও? দারুণ আবিষ্কারে যেসব জবাব দিয়েছো তার রিভিউ করো। আইডিয়া পেতে এ বইয়ের মিশন স্টেটমেন্টের আইডিয়াগুলো চোখ বুলাও। সময় নাও এবং যে পদ্ধতি তোমার পছন্দ সেটি দিয়ে তোমার নিজের মিশন স্টেটমেন্ট গঠন করো।

পদ্ধতি-৫ : আলস্য : যদি তুমি খুব বেশি অলস হও, তাহলে ইউএস আর্মির স্লোগান 'Be All That You Can Be' কে ব্যবহার করো তোমার পার্সোনাল মিশন স্টেটমেন্ট হিসেবে।

মিশন স্টেটমেন্ট লিখতে গিয়ে কিশোর-কিশোরীরা সবচেয়ে বড় ভুল করে বসে যে, এটিকে নিখুঁত করে তুলতে এতো বেশি সময় ব্যয় করে যে, শেষতক শুরুই করতে পারে না। ভুলভাল থাকলেও একটি খসড়া স্টেটমেন্ট লিখে পরে এটি শুধরে নেয়া বরং অনেক ভালো।

টিনেজাররা মিশন স্টেটমেন্ট লিখতে গিয়ে আরেকটি মস্ত ভুল করে, তা হলো অন্যদের মতো করে লেখার চেষ্টা করে। এতে কোনো লাভ হয় না। মিশন স্টেটমেন্ট বিভিন্ন আকার এবং ঢঙে হতে পারে—কবিতা, উক্তি, ছত্র, অনেক শব্দের সমারোহ, একটি মাত্র শব্দ ইত্যাদি। অন্যেরা কী লিখলো তার জন্য অপেক্ষার দরকার নেই। তুমি তো টিচারের জন্য লিখছো না যে, পরে এতে নম্বর পাবে। এটি তোমার গোপন ডকুমেন্ট। নিজেকে প্রশ্ন করো—এটি কি আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারছে? জবাব যদি হয় হ্যাঁ, তাহলে লিখে ফেলো। একবার লেখার পরে এটি এমন কোনো জায়গায় রেখে দিও যাতে সহজেই হাতে পাওয়া যায়।

তিনটে হুঁশিয়ারি

হুঁশিয়ারি-১. নেগেটিভ লেভেল : কেউ কি তোমাকে কখনও তোমার গায়ে নেতিবাচক তকমা এঁটে দিয়েছে? তোমার পরিবার, শিক্ষক অথবা বন্ধুবান্ধব?
'তোমার অমুক মহল্লার মানুষজন আসলে এরকমই। সবসময় ঝামেলা করে।'
'তোমার মতো আলসে আমি দু'টি দেখিনি। একটু গা ঝাড়া দিয়ে ওঠো না কেন?'
'ওই যে সুজি। কোনো কম্মের না।'

তোমার কথা আমি জানি না, তবে কেউ বেহুদা আমার ওপর কোনো নেতিবাচক তকমা এঁটে দিলে রাগে গা রি রি করে। তবে কেউ খামোকা এরকম কোনো তকমা এঁটে দিলে পাত্তা দেবে না। বিপদ হয় তখন যখন তুমি এসব তকমাগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করো। কারণ লেবেল বা তকমাগুলো প্যারাডাইমের মতো। তুমি যা দেখবে তুমি তাই পাবে। ধরো, তোমাকে কেউ অলস বলতে লাগলো, তোমার একসময় মনে হবে তুমি সত্যি বুঝি আলসে। আর এরকম বিশ্বাস মনে গেঁথে গেলে তুমি সত্যি অলস হয়ে পড়বে। কাজেই এসব নেগেটিভ লেবেলকে একদমই পাত্তা দেবে না।

হুঁশিয়ারি-২. 'সব শেষ' সিনড্রোম : আরেকটি হুঁশিয়ারি হলো যখন তুমি এক বা একাধিক ভুল করো এবং এমন মন খারাপ হয় যে ভাবো 'সব শেষ হয়ে গেল।' তখন নিজেকে তুমি ধ্বংস করে দিতে চাও।

কিন্তু আসলে সব শেষ হয়ে যায়নি। কখনও হয় না। অনেক কিশোর-কিশোরীর জীবনেই এরকম সময় আসে, যখন তারা নানান ভুল করে এবং হতাশায় ভুগতে থাকে। ভুল মানুষই করে। ছেলে-বুড়ো সবাই ভুল করে। কিন্তু এতে হতাশ না হয়ে মাথাটা খাড়া করে চলো।

হুঁশিয়ারি-৩. ভুল দেয়াল : তুমি কোনো কিছু পাবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করলে। কিন্তু সেটি পাবার পরে ভেতরটা কেমন শূন্য ও ফাঁকা মনে হলো। এরকমটি হয়েছে কখনও? আমরা সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টায় এমন মশগুল থাকি যে, খেয়ালও করি না মইটি সঠিক দেয়ালে লাগানো হয়েছে কিনা। ভুল পথে গেলে শেষে আমাদেরকেই যন্ত্রণা পোহাতে হবে।

তোমার মই সঠিক দেয়ালে ফিট করা হয়েছে কিনা বুঝবে কীভাবে? থামো, প্রশ্ন করো নিজেকে, 'আমি যে জীবন যাপন করছি তা কি আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে?' নিজের বিবেকের কথা শোনো। ওটা তোমাকে কী বলছে?

আমাদের জীবন সবসময় ১২০ ডিগ্রিতে ঘুরে যাবে এমনটি আশা করা ভুল। প্রায়ই আমাদের ছোট ছোট শিফট দরকার। সেই পরিবর্তনগুলো আবার গন্তব্যে

বিরাট পরিবর্তন এনে দিতে পারে। ধরো: তুমি নিউইয়র্ক থেকে ইসরায়েলের তেল আবিব যাবে, কিন্তু ১ ডিগ্রি উত্তরে সরে গেলেই তোমাকে তেল আবিবের বদলে মস্কো নামতে হবে।

লক্ষ্যে এগিয়ে যাও

একবার তোমার মিশন ঠিক করতে পারলে তুমি লক্ষ্য স্থিরও করতে পারবে। মিশন স্টেটমেন্টের চেয়ে লক্ষ্য স্থির করা অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট এবং তোমার মিশন ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে ফেলতে সাহায্য করবে। তোমার ব্যক্তিগত মিশন যদি হয় গোটা একটি পিজ্জা ভক্ষণ, তোমার লক্ষ্য হবে ওটাকে ছোট ছোট টুকরো করে কাটা।

অতীতে যেসব ভুলচুক করেছো তা ভুলে যাও। জর্জ বার্নার্ড শ'র উপদেশ মেনে চলো। তিনি বলেছেন, 'আমি যখন তরুণ ছিলাম লক্ষ্য করেছি আমি যেসব কাজ করেছি তার দশটির মধ্যে নয়টিই ব্যর্থ হয়েছে। তবে আমি ব্যর্থ মানব হতে চাইনি, তাই আমি আরও দশবার কাজ করেছি।'

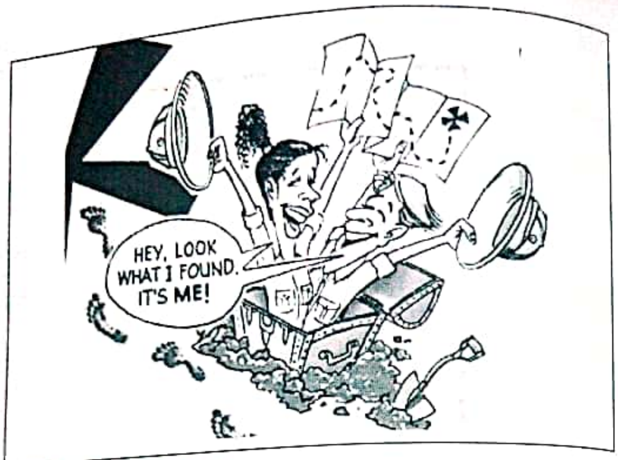
এখানে লক্ষ্য স্থির করার পাঁচটি চাবিকাঠি দেয়া হলো।

চাবিকাঠি ১ : কী ঘটতে পারে

আমাদের যখন মুড থাকে তখন আমরা কতো লক্ষ্য স্থির করি, তবে পরে দেখি সেই লক্ষ্য হাসিলের পেছনে ছোটার তাগিদ বা শক্তি আমাদের নেই। কেন এমন হয়? কারণ আমরা কী ঘটতে পারে তা আমলে নিই না।

ধরো, তুমি লক্ষ্য স্থির করলে এ বছর পরীক্ষায় ভালো মার্কস পাবে। বেশ। কিন্তু তার আগে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করো। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হলে তোমাকে কী কী করতে হবে? বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাবাজি কমিয়ে অংক এবং গ্রামারের পেছনে বেশি সময় দিতে হবে। টিভি দেখা কমিয়ে হোমওয়ার্ক বেশি করতে হবে।

আচ্ছা, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পেলে কী হবে? মনে সন্তুষ্টি আসবে কাজটা পেরেছো বলে? ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবে? ভালো চাকরি পাবে? এখন নিজেকে প্রশ্ন করো, 'আমি কি এ স্যাক্রিফাইসগুলো করতে প্রস্তুত?' যদি প্রস্তুত না থাকো তবে কোরো না। যেসব কমিটমেন্ট রক্ষা করতে পারবে না, তার প্রতিশ্রুতি নিজেকে দিয়ো না। একসঙ্গে সব পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবার টার্গেট না করে দুটি বিষয়ে ভালো মার্কস পাবার লক্ষ্য স্থির করো। এভাবে এগিয়ে যাও।



চাবিকাঠি ২ : লিখে রাখো

বলা হয়, 'লক্ষ্য লিখে না রাখা মানে এটি স্রেফ একটি ইচ্ছে।' এর মধ্যে যদি বা কিন্তুর কোনো আশ্রয় নেই। লিখিত লক্ষ্য দশ গুণ বেশি শক্তিশালী। লুইজি নামে এক তরুণী আমাকে বলেছিল, সে তার লক্ষ্য লিখে রেখেছিল বলে অবশেষে যথার্থ ম্যারেজ পার্টনারের দেখা পেয়েছিল। সে আবিষ্কার করেছিল, নিজের লক্ষ্য লিখে রাখার মধ্যে ম্যাজিক্যাল একটি ব্যাপার রয়েছে। কিছু লিখে রাখা মানে সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যের দিকে তুমি এগোচ্ছো, এটি লক্ষ্য স্থিরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিনেত্রী মিলি টমলিন বলেছেন, আমি সবসময়ই কিছু একটা হতে চেয়েছি। তবে আমার আরও স্পেসিফিক হওয়া উচিত ছিল।'

চাবিকাঠি ৩ : স্রেফ করে ফেলো!

মেক্সিকোতে কোর্টেজের অভিযান নিয়ে একটি গল্প পড়েছিলাম। তিনি পাঁচশত লোক এবং এগারোখানা জাহাজ নিয়ে কিউবা থেকে ইউকাটানের উপকূলে পৌছান ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে। মূল ভূখণ্ডে পৌছে তিনি এমন একটি কাণ্ড করে বসেন যা অন্য কোনো অভিযাত্রার নেতারা কষ্মিনকালেও চিন্তা করেননি। তিনি তাঁর জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলেন, যাতে আর পিছু হঠার অবকাশ না থাকে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, হয় অনুসন্ধান নতুবা মৃত্যু।

একবার এক ক্যাপ্টেন এবং তাঁর লেফটেন্যান্টের মধ্যে কথোপোকথনের গল্প শুনেছিলাম:

'লেফটেন্যান্ট, তুমি আমার জন্য এ চিঠিটা কি ডেলিভারি দিতে পারবে?'

'আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো, স্যার।'

'না, আমি তোমার সর্বোচ্চ চেষ্টা চাই না। আমি চাই চিঠিটি তুমি ডেলিভারি দেবে।'

'আমি এটা করবো নয়তো মরবো।'

'তুমি ভুল বুঝছো লেফটেন্যান্ট, আমি তোমাকে মরতে বলছি না। আমি চাই চিঠিটা তুমি ডেলিভারি দেবে।'

অবশেষে লেফটেন্যান্ট বিষয়টি বুঝতে পারলো এবং বললো, 'আমি কাজটা করে দেবো, স্যার।'

আমরা যখন কোনো কাজ করার বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই, এটি সম্পাদন করার জন্য আমাদের শক্তির বৃদ্ধি ঘটে।

'তুমি যদি কাজটা করো,' বলেছেন র‍্যালফ ওয়ালিজ এমারসন, 'তুমি সেই শক্তিটি পাবে।'

আমি যতবার নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি কোনো কাজ করার জন্য 'মনে হয়েছে আমি ইচ্ছাশক্তি, দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার স্বর্ণখণি খুঁড়েছি, যা আমার কখনও ছিল বলে ভাবতে পারতাম না। যারা প্রতিশ্রুতি দেয় তারা কোনো না কোনো রাস্তা খুঁজে পায়। প্রখ্যাত জেডাই মাস্টার ইয়োডা বলেছেন, 'করবে অথবা করবে না। চেষ্টা বলে কিছু নেই।'

চাবিকাঠি ৪ : প্রয়োজনীয় মুহূর্তগুলো ব্যবহার করো

জীবনের কিছু মুহূর্ত প্রেরণা এবং শক্তি দিয়ে তৈরি। লক্ষ্য স্থিরে এ মুহূর্তগুলোর আবশ্যকতা রয়েছে।

নিচে একটি তালিকা দেয়া হলো কিছু মুহূর্তের যা নতুন লক্ষ্য স্থিরে তোমাকে প্রেরণা যোগাতে পারে।

* স্কুলের নতুন বছর
* জীবন বদলে দেয়া কোনো অভিজ্ঞতা
* সম্পর্কে ছাড়াছাড়ি
* নতুন চাকরি
* নতুন সম্পর্ক
* দ্বিতীয় কোনো সুযোগ
* জন্ম

* মৃত্যু
* কোনো অ্যানিভার্সারি
* বিজয়
* নতুন শহরে গমন
* নতুন সিজন
* গ্রাজুয়েশন
* বিয়ে
* ডিভোর্স
* প্রমোশন
* ডিমোশন
* নতুন লুক
* নতুন দিন
* নতুন গাড়ি
* নতুন ব্যবসা
* নতুন উদ্যোগ গ্রহণ

চাবিকাঠি ৫ : প্ররোচণা

তুমি জীবনে অনেক কিছুই করতে পারবে যদি প্ররোচিত হও অথবা অপরের কাছ থেকে ধার কর শক্তি। ধরো, তুমি একটি লক্ষ্য স্থির করলে। এখন তুমি কীভাবে প্ররোচিত হবে? হয়তো এমন কোনো বন্ধুকে খুঁজে পেলে যার লক্ষ্য একইরকম। দু'জনে মিলে একত্রে কাজ করতে পারো এবং একে অপরের চিয়ারলিডার হতে পারো। অথবা তোমার বাবা-মাকে তোমার লক্ষ্যের কথা বলতে পারো এবং তাদের মাথায় এটি ঢোকানোর চেষ্টা করতে পারো। যত বেশি প্ররোচিত হবে ততই সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জীবনকে করে তোলো অনন্যসাধারণ

জীবন ছোট। এ কথাটিই বলা হয়েছে টম গুলম্যানের ক্ল্যাসিক ছবি ডেড *পোয়েটস সোসাইটিতে*। তোমাকে মনে রাখতে হবে জীবন একটি মিশন, ক্যারিয়ার নয়। ক্যারিয়ার হলো পেশা। মিশন জানতে চায়, 'আমি কীভাবে ভিন্ন কিছু তৈরি করতে পারবো?' মার্টিন লুথার কিংয়ের মিশন ছিলো, পৃথিবীর সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষা। গান্ধীর মিশন ছিলো, ত্রিশ কোটি ভারতীয়কে স্বাধীন

করা। মাদার তেরেসার মিশন ছিলো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্য যোগানো।

এগুলো চূড়ান্ত উদাহরণ। তোমাকে তোমার মিশন দিয়ে পৃথিবী বদলে দিতে হবে না। শিক্ষাবিদ ম্যারেন মুরিটসেন যথার্থই বলেছেন, 'আমাদের বেশিরভাগই কখনও বড় কিছু করি না। কিন্তু অন্যভাবে ছোট ছোট কাজও করা যায়।'

ছোট ছোট পদক্ষেপ

১) নিজের ক্যারিয়ারে সফল হতে তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার প্রয়োজন হবে তোমার। তোমাকে আরও বেশি সংগঠিত হতে হবে, অন্যদের সামনে আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে শিখতে হবে, লেখালেখির দক্ষতা থাকতে হবে।

২) তোমার মিশন স্টেটমেন্ট ৩০ দিন টানা রিভিউ করবে। এটি তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

৩) আয়নায় তাকিয়ে জিজ্ঞেস করো, 'আমি কি আমার মতো কাউকে বিয়ে করতে চাই?' যদি না হয় তাহলে তোমার ভেতরে যে গুণগুলো নেই, তা আনার চেষ্টা করো।

৪) তোমার স্কুল গাইডেন্স কিংবা এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সেলরের কাছে গিয়ে নিজের ক্যারিয়ারের সুযোগ-সুবিধাগুলো নিয়ে আলোচনা করো। একটি atitude Test করাতে পারো তাহলে নিজের ট্যালেন্ট, সামর্থ এবং আগ্রহ মূল্যায়নে সুবিধা হবে।

৫) জীবনে এ মুহূর্তে প্রধান ক্রসরোড কী অনুভব করছো? অবশেষে কোন পথটি বেছে নেবে?

আমি যে ক্রসরোডটির মুখোমুখি হচ্ছি—

যে পথটি আমি বেছে নিতে চাই—

৬) দারুণ আবিষ্কারের একটি কপি করে ফেলো। তারপর কোনো বন্ধু বা পারিবারিক সদস্যের সহায়তায় একপা একপা করে এগোও।

৭) নিজের লক্ষ্য নিয়ে ভাবো। এগুলো কাগজে লিখে নিয়েছো? না লিখলে লিখে ফেলো। লক্ষ্য লিখে রাখবে, না হলো ওটা শুধু মনেই থেকে যাবে।

৮) তোমার ওপর যেসব নেতিবাচক তকমা এঁটে দেয়া হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করো। তুমি এসব তকমার কী কী বদলাতে পারবে তা নিয়ে ভাবো।

নেতিবাচক তকমা—

কীভাবে এগুলো বদলাবো?

নেতিবাচক তকমা নিয়ে ভাবো এবং তা খুঁজে বের করে জীবনের খাতা থেকে কেটে বাদ করে দাও একেবারে।

অভ্যাস ৩

আগের কাজ আগে

উইল এবং উইলনট পাওয়ার



আমি টেপে এক লেখকের বক্তৃতা শুনছিলাম। সে একালের টিনেজারদের সঙ্গে দেড়শো বছর আগের কিশোর-কিশোরীদের তুলনা করছিল। আমি বেশ আগ্রহ নিয়েই তার কথা শুনছিলাম। তার অনেক বক্তব্যের সঙ্গে একমতও ছিলাম। কিন্তু যখন সে বললো, 'দেড়শো বছর আগের কিশোর-কিশোরীরা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতো, তা ছিল কঠোর পরিশ্রম। আর আজকের টিনেজাররা কাজের অভাবে থাকে।'

আরে, বলে কী এই লোক? কাজের অভাব? আমার তো ধারণা আজকালকার টিনেজাররা আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকে এবং তাদের কাজও করতে হয় প্রচুর। নিজের চোখে এসব দেখেছি। এখনকার টিনেজাররা স্কুলে যায়, এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজ করে, বন্ধুদের সঙ্গে দল গঠন করে, খেলাধুলা করে, পার্টটাইম জব করে, ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়ায় বাবা-মাকে সাহায্য করে।' আরও কতো কী কাজের চাপে তাদের নিঃশ্বাস নেয়ার জো নেই। আর ওই লোক বলে কিনা এ যুগের ছেলেমেয়েদের হাতে কোনো কাজ নেই? দুধ দোয়ানো আর বেড়া বানানোই বুঝি কঠিন কাজ? আধুনিক টিনেজাররা এরচেয়ে ঢের বেশি কাজ করে।

তোমাদের হাতে কতো কাজ! যে জন্য সময় করেও উঠতে পারো না। তবে ৩নং অভ্যাস বলছে, আগের কাজ আগে সারতে হবে। জানতে হবে কোন কাজটাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়া দরকার। তবে সময় বাঁচালেই কেবল হবে না। আগের কাজ আগে করার অর্থ কঠিন মুহূর্তগুলোকে পাত্তা না দেওয়াও বটে।

আমাদের লক্ষ্য এবং অভিপ্রায়ের একটি তালিকা থাকতে পারে, তবে কোনটিকে তালিকায় সবার আগে রাখা উচিত সেটি বাছাই একটু কঠিনই। এজন্য আমি ৩নং অভ্যাসকে উইল পাওয়ার বা ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে তুলনা করেছি। এবং বলেছি, উইল নট পাওয়ারের কথা। এটি হলো, যেসব কাজ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং খুব বেশি চাপ পড়ে যায় সেগুলোকে না বলার শক্তি।

প্রথম তিনটি অভ্যাস গড়ে উঠেছে একটির ওপরে আরেকটি। ১নং অভ্যাস বলছে, 'তুমি চালক, যাত্রী নও।' ২নং অভ্যাস বলছে, 'সিদ্ধান্ত নাও কোথায় যাবে

এবং ওখানে পৌঁছাবার একখানা মানচিত্র অংকন করো।' আর ৩নং অভ্যাস বলছে, 'ওখানে চলে যাও। কোনো রোড ব্লককে তোমার বাধা হতে দিও না।'

জীবনে আরও কিছু গোছগাছ করো

কোথাও যাওয়ার জন্য যখন সুটকেস গোছগাছ করো তখন কি কদাপি লক্ষ্য করেছো, ভেতরে কতো সুন্দরভাবে জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যায় যত্রতত্র ছড়িয়ে না ফেলে? তোমার জীবনটাও কিন্তু সুটকেস গোছানোর মতো। যত সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলবে নিজেকে, তত বেশি গোছগাছ করে নিতে পারবে- আরও বেশি সময় দিতে পারবে পরিবারকে, স্কুলকে, নিজেকে।

তোমাকে দুটি টাইম কোয়াড্রান্টের কথা বলি। এটি গঠিত দুটি প্রাথমিক উপাদান দিয়ে—'গুরুত্বপূর্ণ এবং 'জরুরি'।

গুরুত্বপূর্ণ—তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, কাজগুলো যা তোমার মিশন এবং লক্ষ্যপূরণে ভূমিকা রাখবে।

জরুরি—যেসব কাজ তোমাকে তাৎক্ষণিকভাবে করতে হবে।

এমনিতে আমাদের সময় বিভক্ত চারটে টাইম কোয়াড্রনটে। এককেটি কোয়াড্রান্টের একেক কাজ এবং একেক রকম ব্যক্তিত্বকে সেটি প্রতিনিধিত্ব করে।

তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছো, আমরা যে সমাজে বাস করছি সেখানে প্রায় সবারই বড্ড তাড়াহুড়ো। আর্জেন্ট ব্যাপার সকলের। আর্জেন্ট ব্যাপার থাকতেই

টাইম কোয়াড্রান্ট

(১) প্রোক্রাস্টিনেটর	২) প্রাইওরাইটাইজার
* কাল পরীক্ষা	১) প্ল্যানিং, লক্ষ্যস্থির করা
* বন্ধু আহত	২) এক সপ্তাহের মধ্যে রচনা তৈরির কথা বলা
* কাজে দেরি	৩) অনুশীলন
* প্রজেক্ট দিতে দেরি	৪) সম্পর্ক
* গাড়ির ব্রেক ফেল	৫) রিলাক্সেশন
(৩) ইয়েস ম্যান	(৪) স্ল্যাকার
১) অপ্রয়োজনীয় ফোনকল	১) খুব বেশি টিভি দেখা
২) কাজে বাধা দান	২) বিরতিহীন ফোন করা
৩) অন্য লোকদের সমস্যা নিয়ে ভাবনা	৩) অতিরিক্ত কম্পিউটার গেম
৪) অহেতুক চাপ	৪) ম্যারাথন শপিং
	৫) বেহুদা সময় নষ্ট করা

পারে। তবে সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বাদ দিয়ে শুধু আর্জেন্ট বা জরুরি কাজেই মেতে থাকি। দেখা যাক তোমরা কে কোন কোয়াড্রান্টে নিজের সময় সবচেয়ে বেশি ব্যয় করো।

কোয়াড্রান্ট ১ : প্রোক্রাস্টিনেটর বা কাজে গড়িমসি করে যে

কোয়াড্রান্ট ১ দিয়ে শুরু করা যাক। এখানে কাজগুলো একই সঙ্গে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। Q1 (কোয়াড্রান্ট ১)-এর মতো কাজ সবসময়ই থাকবে যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। যেমন কোনো অসুস্থ শিশুকে সাহায্য করা কিংবা কোনো মিটিংয়ের ডেডলাইন। তবে আমরা অনেক Q1 নিয়ে অহেতুক মাথাব্যথা করি, কারণ আমরা প্রোক্রাস্টিনেট। যেমন আমরা হোমওয়ার্ক করি না এবং পরীক্ষা এলে রাত জেগে পড়াশোনা করে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজাই। আবার আমাদের গাড়িটার অনেকদিন যত্নআত্তি নিই না। ফলে ওটা অকেজো হয়ে পড়লে সারানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। Q1 জীবনেরই অংশ। কিন্তু Q1 এর জন্য যদি অত্যধিক সময় ব্যয় করতে থাকি তাহলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ব।

একজন প্রোক্রাস্টিনেটর ইমার্জেন্সিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। সে কোনো কাজই করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটা ক্রাইসিসে পরিণত হয়। তবে এটিই তার বেশ পছন্দ, কারণ শেষ মিনিটে তাড়াহুড়ো করে কাজ করতেই সে যেন মজা পায়। ইমার্জেন্সি না হওয়া পর্যন্ত সে যেন নড়াচড়া করতেই পারে না।

প্রোক্রাস্টিনেটদের আগ বেড়ে কখনও পরিকল্পনা ধাতেই নেই। তাহলে সে শেষ মুহূর্তে সমস্যা সমাধানের উত্তেজনা নষ্ট হয়ে যাবে!

আমি স্কুলে ছিলাম প্রোক্রাস্টিনেটর। সারা বছর পড়াশোনায় ফাঁকি দিতাম, হোমওয়ার্ক ঠিকঠাক করতে চাইতাম না, আর যেই পরীক্ষা আসতো, লাফিয়ে উঠতাম। রাত জেগে খেটে পাস করতাম বটে কিন্তু শিখতাম না কিছুই। এর পরিণাম আমাকে ভোগ করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কর্মক্ষেত্রেও।

Q1 এর জন্য খুব বেশি সময় ব্যয় করলে যা হয় :

* উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ে।
* নিজে ধ্বংস হয়ে যায়।
* মিডিওকার পারফরমেন্স করে।

কোয়াড্রান্ট ২ : প্রাইওরাইটাইজার

এরা সব কাজকে অগ্রাধিকার দেয় এবং বলে সবচেয়ে ভালো কাজটি শেষ করবো।

কোয়াড্রান্ট ৩ : ইয়েস-ম্যান

Q3 -র কাছে কাজগুলো আর্জেন্ট হলেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের কাজ হলো, অন্যদের খুশি করা বা খুশি রাখা। Q3 -র লোকেরা যেসব কাজ করে তা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তোমার কাছে তা মনে নাও হতে পারে। কিন্তু তুমি 'না' বলতে পারছো না পাছে অপর পক্ষ মাইণ্ড করে বসে!

Q3 র ইয়েস-ম্যানদের বড্ড সমস্যা, তারা কাউকে না বলতে পারে না বলে। সে সবাইকে খুশি করতে গিয়ে শেষে কাউকেই খুশি করতে পারে না। এমনকী নিজেকেও। তার ওপর সবসময়ই প্রচণ্ড চাপ থাকে, কারণ সে জনপ্রিয় থাকতে চায় এবং এ অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াতেও রাজি নয়। সে তার বন্ধু বা বস কাউকে অখুশি করতে চায় না। কেউ তাকে প্রস্তাব দিল রাত থেকে ভোর পর্যন্ত জাহাজ ভ্রমণ করবে। সাতপাঁচ না ভেবেই রাজি হয়ে গেল স্রেফ বন্ধুকে খুশি করতে। অথচ পরদিন যে তার পরীক্ষা, তা তার মনেই নেই! অথবা মনে থাকলেও বন্ধু অখুশি হতে পারে ভেবে পরীক্ষার কথা চেপে গেছে বেমালুম!

এ ধরনের লোক তার বোনকে বললো, সে তার অংক করে দেবে। এমন সময় ফোন এলে সে ফোনে এমন বকর বকর শুরু করে দিল যে, বোনকে অংক করানোর কথা মাথাতেই রইলো না। যদিও ফোনটি অতো জরুরি কিছু ছিল না।

সে সাঁতারুর দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু তার বাবা ভালো সাঁতারু বলে বাবাকে খুশি করতে সে সুইমিং টিমে নাম লিখে ফেললো।

আমার মনে হয় আমাদের সবারই, আমিসহ, অন্য সবার মধ্যে আছে Q3। কিন্তু সবকিছুতে 'হ্যাঁ' বললে তো কোনো কাজই সমাধা হবে না এবং বুঝতেও পারবো না কোন কাজটি আসলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত কমেডিয়ান বিল কসবি বলেছিলেন, 'সাফল্যের চাবি কী আমি জানি না, তবে ব্যর্থতার চাবি হলো, সকলকে খুশি করার চেষ্টা।' Q3 অতিশয় নিম্নমানের কোয়াড্রান্ট, কারণ এটির কোনো মেরুদণ্ড নেই। এটি চপলমতির এবং বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয় সেদিকে উড়ে যায়।

Q3-র পেছনে বেশি সময় ব্যয় করলে যা হবে:

* 'চামচা' হিসেবে খ্যাতি পাবে
* ডিসিপ্লিন বলে কিছু শিখবে না
* নিজেকে অন্যের পাপোস বলে মনে হবে।

কোয়াড্রান্ট ৪ : প্র্যাকার বা কুঁড়ে

Q4-এর কর্মে না আছে কোনো জরুরি ব্যাপার, না গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ ধরনের লোকজন সবকিছুই অতিরিক্ত ভালোবাসে। তারা বেশি টিভি দেখতে পছন্দ করে, বেশি ঘুমাতে ভালোবাসে, ভিডিও গেমে তাদের বেশি বেশি আসক্তি, ইন্টারনেটে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে। এদের অতি প্রিয় কাজ একবার ফোনে কথা বলা শুরু করলে তিন ঘণ্টার আগে ছাড়ে না। আর ম্যারাথন শপিংয়ে তো তাদের তুলনাই নেই।

এই কুঁড়েরা হলো প্রফেশনাল লোফার। দুপুর পর্যন্ত তারা ঘুমায়, কমিক বই পড়ে সপ্তাহ জুড়ে, কোনো কাজকম্ম করে না। স্কুলে যেতে চায় না।

সিনেমা দেখা, ইন্টারনেটে চ্যাটিং বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা স্বাভাবিক জীবন যাপনেরই অংশ। কিন্তু এর পেছনে যখন অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা হয়, সেটি তখন সময় নষ্ট করার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। তুমি এ সীমারেখা কখন অতিক্রম করছো সেটা জানতে পারবে। রিল্যাক্স করার জন্য প্রথমবার টিভি দেখো, সমস্যা নেই। তবে প্রতিদিন রাত দুইটা পর্যন্ত জেগে টিভি দেখা কোনো কাজের কথা নয়। এতে সময়ই নষ্ট হবে শুধু।

Q4-এর ফলাফল হলো:

* দায়িত্বহীনতা
* অপরাধবোধে ভোগা
* কুঁড়েমি
* আড্ডাবাজি বা অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ব্যয় করা।

সাপ্তাহিক প্ল্যান করো

প্রতি সপ্তাহে পনেরো মিনিট সময় নাও প্ল্যান করার জন্য এবং দ্যাখো এটা তোমার জীবনে কী ভিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে?

কেন সাপ্তাহিক প্ল্যান?

কারণ সপ্তাহজুড়ে আমরা ভালোভাবে চিন্তা করতে পারি। প্রতিদিনকার প্ল্যান খুব একটা ভালো হয় না, ফোকাস করার জায়গা থাকে কম, আর মাসিক প্ল্যান ফোকাসের জন্য খুব বেশি বড় হয়ে যায়। নিচের তিনটি পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিকল্পনাগুলো করা যেতে পারে।

পদক্ষেপ ১ : প্রতিটি সপ্তাহের শেষে বা শুরুতে বসে ভাবো, সামনের সপ্তাহে তুমি কী কী কাজ করবে? নিজেকে প্রশ্ন করো, 'এ সপ্তাহে আমার কোন কাজটি করা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? এসব পরিকল্পনাকে মিনি লক্ষ্য হিসেবে ধরা যেতে পারে। এগুলো তোমার মিশন স্টেটমেন্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যের সঙ্গে জুড়ে দেবে। এক সপ্তাহের জন্য যেসব প্ল্যান তুমি করতে পারো:

* সায়েন্স বই পড়বে
* বই পাঠ শেষ করবে
* মেগানের খেলায় অংশ নেবে
* ইসাবেলার পার্টিতে যাবে
* তিনবার এক্সারসাইজ করবে

পদক্ষেপ ২ : তুমি বড় পাথর দিয়ে কখনো এক্সপেরিমেন্ট করেছো? একটা বালতি বা ঝুড়ি নিয়ে তার অর্ধেকটা ভরে ফেলো নুড়ি পাথর দিয়ে। তারপর এগুলোর ওপরে বড় বড় পাথরের টুকরো রাখো। কিন্তু দেখবে ফিট করবে না। কাজেই পাথরগুলো ফেলে দিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করো। এবারে বালতি বা ঝুড়িতে প্রথমে বড় পাথরগুলো রাখো, তার ওপর নুড়ি পাথর। দেখবে বড় পাথরের ফাঁক ফোকরে নুড়িগুলো দিব্যি ফিট করে গেছে। সমস্যা ছিল পাথর এবং নুড়ি পাথর সাজানোয়। আগে নুড়িপাথর রাখলে বড় পাথর খণ্ডগুলো ফিট করবে না। তবে আগে বড় পাথরের টুকরোগুলো রাখলে নুড়িগুলো দিব্যি ফিট করে যায়। বড় পাথরগুলো তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে। নুড়িগুলো প্রতিনিধিত্ব করছে, ছোট ছোট জিনিসের যা তোমার মূল্যবান সময় খেয়ে নেয়। এ এক্সপেরিমেন্টের মোরাল হলো—তোমার বড় পাথরগুলোর শেডিউল আগে না করলে ফল পাবে না।

তোমার সাপ্তাহিক পরিকল্পনায় বড় পাথরগুলো দিয়ে সময়কে আটকে রাখো। যেমন, তুমি ভাবছো ইতিহাস পড়ার জন্য সেরা সময় হলো, মঙ্গলবার রাত এবং দাদীমার সঙ্গে কথা বলার সবচেয়ে ভালো সময় হলো, রোববার বিকেল। এখন এ সময়গুলো ব্লক করে রাখো। বিষয়টা অনেকটা রিজার্ভেশনের মতো। বড় পাথর দিয়ে সময় বা দিন ব্লক করে রাখলে অন্যান্য দিনগুলো এমনিতেই ফিট হয়ে যাবে। আর না হলেই বা কী? নুড়ি পাথর সাজানোর বদলে বড় পাথর সরিয়ে নেবে।

পদক্ষেপ ৩ : তোমার বড় পাথরগুলো বুকড্ হয়ে গেলে ছোট ছোট কাজ কী কী করবে তার একটা শেডিউল করে ফেলো। এ সবের মধ্যে থাকবে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই টাইম ম্যানেজমেন্ট কি সত্যি কাজ করে? হ্যাঁ, করে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক টিনেজারের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, যারা বলেছে ওপরের পরামর্শ তাদের অনেক কাজে লেগেছে। ফিলিপ্পা নামে একটি মেয়ে লিখেছিল:

আমার মানসিক দুশ্চিন্তার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছিল। কারণ, আমি আর চিন্তা করতে পারছিলাম না সামনের ক'টা দিন কী করবো? এখন আমি আমার শিডিউল করে ফেলেছি এবং সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার যখন মন খারাপ থাকে এবং দুশ্চিন্তায় থাকি, আমার শিডিউলের দিকে তাকাই এবং বুঝতে পারি এখনও অনেক কিছু করার মতো সময় আমার হাতে আছে।

কমফোর্ট জোন এবং কারেজ জোন

আগের কাজ আগে করার জন্য সাহস দরকার। কমফোর্ট জোনে রয়েছে পরিচিত সবকিছু। পরিচিত মানুষজন, জায়গা, পরিচিত কর্মকাণ্ড। তোমার কমফোর্ট জোন ঝুঁকিমুক্ত। এসব বাউন্ডারির মধ্যে আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারি।

পক্ষান্তরে, কারেজ জোনে তোমাকে নতুন বন্ধু করতে হবে, বড়সড় অডিয়েন্সের সামনে বক্তৃতা দিতে হবে। তবে এ জোনে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চার, ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ। এখানে সবকিছুই অস্বস্তিকর মনে হবে। এ ক্ষেত্রটিতে বিরাজমান অনিশ্চয়তা, চাপ, পরিবর্তন, ব্যর্থতার সম্ভাবনা। তবে এটি সুযোগ-সুবিধাও দেবে এবং এটিই একমাত্র জায়গা, যেখানে তুমি তোমার পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারবে। এটি আবার কমফোর্ট জোনে পরবে না।



তাহলে তোমার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, কমফোর্ট জোন উপভোগ করতে সমস্যা কী?

কোনো সমস্যা নেই। আসলে আমরা আমাদের বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটাই। কিন্তু অচেনা নদীতে না নামলে জীবন চেনা যায় না। আমি অনেককে চিনি, যারা নতুন নতুন জিনিস করতে চায় অথচ নিরাপত্তার জগতে ডানা ছড়িয়ে বাস করছে। তাদের কাছে জীবনটা বড়ই পানসে। কেইবা পানসে জীবন চায়? নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে প্যারাস্যুট চেপে মাঝেমধ্যে কারেজ জোনে লাফিয়ে পড়তে সমস্যা কী? মনে রেখো, ঝুঁকিহীন জীবন যাপনের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

ভয় যেন তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য না করে

পৃথিবীতে বাজে যতগুলো আবেগ রয়েছে তার মধ্যে ভয় একটি। আমার যখন মনে পড়ে, শুধু ভয় পাবার কারণে জীবনে অনেক কাজেই সফল হতে পারিনি, ভেতরটা পোড়ে। হাইস্কুলে পড়ার সময় সারাহ নামের একটি সুন্দরী মেয়ের ওপর ক্রাশ খেয়েছিলাম কিন্তু তাকে নিজের অনুভূতির কথা কোনোদিন জানাতে পারিনি, কারণ আমার ভয়, আমার কানে ফিসফিস করে বলতো, 'ও তোমাকে পছন্দ না-ও করতে পারে। মনে আছে একবার প্র্যাকটিসের পরেও স্কুল ফুটবল টিম ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রতিযোগিতার ভয়ে। আমার সারাজীবনে অনেক ক্লাসই আমি করতে পরিনি ভয়ে, বন্ধুত্ব করা হয়ে ওঠেনি তাও এ জন্যই, খেলার দলে যোগ দিতে পারিনি এই কুৎসিত ভয়টার জন্য।

আমার বাবা একবার আমাকে একটি কথা বলেছিলেন, যা জীবনে ভুলবো না। 'শন', বলেছিলেন তিনি, 'ভয় যেন কখনো তোমাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে না পারে। তুমি নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নেবে।'

আইডিয়াটি দারুণ না? সেইসব বীরোচিত কর্মকাণ্ডের কথা চিন্তা করো যেগুলো ভয়ের মুখোমুখি হয়ে করা হয়েছিল। নেলসন ম্যান্ডেলার কথা ভাবো। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই করেছেন। এ অপরাধে সাতাশ বছর তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। পরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হন। কী ঘটতো যদি তিনি ভয় পেতেন এ সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে? কিংবা সুসান বি অ্যান্থনির কথা স্মরণ করা যায়, যিনি প্রচণ্ড সাহস নিয়ে দীর্ঘ একটা কাল নারী ভোটের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন সংবিধানে নারী ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের কথাও বলতে পারি, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী জার্মা নির বিরুদ্ধে মুক্ত পৃথিবীকে যুদ্ধ করতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এঁরা

কেউই তাঁদের কাজ করতে ভয় পাননি।

ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ কাজ নয়। তবে কাজটা করার পরে মনে অনেক আনন্দও হয়। কাজেই কোনো কাজ করতে ভয় পেয়ো না। সাহস করে এগিয়ে যাও। দেখবে সফল হবে।

জেতা মানে বারবার পতন থেকে উঠে দাঁড়ানো

আমরা ভয়ের জগতে বাস করি এবং এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়ও। প্রবাদ আছে, 'ভয়কে জয় করতে এগিয়ে যাও।' আর কোনো কিছু জিতে নেয়া মানে বারংবার পতন থেকে উঠে দাঁড়ানো। আমরা কতোবার পড়ে গেলাম তা না। তবে সুযোগগুলো কতোবার হারালাম তা ভাবাই বাঞ্ছনীয়। আমরা অনেক বিখ্যাত মানুষের কথা জানি, যাঁরা বহুবার ব্যর্থ হয়েছেন।

আলবার্ট আইনস্টাইনের মুখে চার বছরের আগে বোলই ফোটেনি। বিটোফেনের মিউজিক টিচার বলেছিলেন, 'সুরকার হিসেবে এর কোনো আশাই নেই।' লুই পাস্তুরকে রসায়নের জগতে 'মিডিওকার বিজ্ঞানী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। রকেট বিজ্ঞানী ভার্নহার ডন ব্রাউন কিশোর বয়সে বীজগণিতে ফেল করেছিলেন। রসায়নবিদ মাদাম কুরী নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির ক্ষেত্র তৈরি করে বিজ্ঞানের চেহারা বদলে দেয়ার আগে প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলেন। মাইকেল জর্ডানকে তাঁর স্কুলের বাস্কেটবল টিম থেকে বাদ দেয়া হয়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ৭ বার নির্বাচনে হেরে ৮ম বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে পার্লামেন্টের সকল সদস্যদের বিরুদ্ধে গিয়ে একাই নিগ্রোদের দাস প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া গেল।

* তিনি বাইশ বছর বয়সে ব্যবসায় লালবাতি জ্বালেন।
* তেইশ বছর বয়সে রাষ্ট্রীয় আইনজীবী হিসেবে পরাজিত হন।
* ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে হারান।
* সাতাশ বছর বয়সে তিনি নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের শিকার হন।
* উনত্রিশ বছর বয়সে স্পিকারের পদ পেতে ব্যর্থ হন।
* চৌত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে সংসদীয় নমিনেশন দেয়া হয়নি।
* উনচল্লিশ বছর বয়সে কংগ্রেসের রি-নমিনেশন হারান।
* ছেচল্লিশ বছর বয়সে সিনেটে পরাজিত হন।
* সাতচল্লিশ বছর বয়সে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্সি হারান।

এই অব্রাহাম লিংকন, একান্ন বছর বয়সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, যতবার ব্যর্থ হয়েছেন ততবারই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং শেষতক তাঁর গন্তব্যে পৌঁছেছেন, অর্জন করেছেন সম্মান এবং সকল দেশ ও জাতির প্রশংসা। আজ ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল পাতায় তাঁর নাম লেখা রয়েছে। এতো কিছু হচ্ছে শুধুমাত্র তার মনোবল না হারানোর কারণে বা ভয় না পাবার কারণে।

কঠিন মুহূর্তে শক্ত থাকো

কবি রবার্ট ফ্রস্ট লিখেছেন, 'একটি জঙ্গলে দুটি রাস্তা চলে গেছে দুই দিকে, এবং আমি কম ব্যবহার করা রাস্তাটি বেছে নিলাম। আর তাতেই সব কিছু কেমন বদলে গেল।

আমি বিশ্বাস করি মানুষের জীবনে অনেক কঠিন মুহূর্ত আসে, আমরা যদি সঠিক পথটি বেছে নিই, তাহলে জীবনের রাস্তায় অনেক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

কঠিন মুহূর্তগুলো আসলে কী? সঠিক কাজটি আর সহজ কাজ করার মাঝের দ্বন্দ্ব নিয়ে সৃষ্টি কঠিন মুহূর্ত। এ হলো এক ধরনের পরীক্ষা, জীবনের মুহূর্তগুলো সংজ্ঞায়িত করা—আমরা এগুলোকে যেভাবে সামাল দেবো, সে আদলে গড়ে উঠবে আমাদের জীবন। ছোট এবং বড় দুইভাবে এগুলো আসে।

ছোট কঠিন মুহূর্তগুলোর আবির্ভাব ঘটে প্রতিদিন। এসবের মধ্যে রয়েছে, অ্যালার্মের শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠে যাওয়া, মেজাজ নিয়ন্ত্রণ কিংবা হোমওয়ার্ক করার জন্য নিজেকে ডিসিপ্লেনের আওতায় নিয়ে আসা। তুমি যদি নিজেকে জয় করতে পারো এবং এসব মুহূর্তে শক্তিশালী থাকতে পারো, তোমার দিনগুলো কাটবে মসৃণ গতিতে।

ছোট কঠিন মুহূর্তগুলোর সঙ্গে তুলনায় বড় কঠিন মুহূর্তগুলো জীবনে প্রায়ই আসে। যেমন ভালো বন্ধু বাছাই, নেতিবাচক চাপ ঠেকিয়ে রাখা, বড় কোনো বিপত্তির পরে রিবাউন্ড বা প্রতিক্ষেপণ করা; তুমি কোনো দল থেকে বাদ পড়তে পারো অথবা তোমাকে তোমার প্রেমিকা ছ্যাঁকা দিতে পারে কিংবা তোমার পরিবারে কারও মৃত্যু হতে পারে। এসব মুহূর্তের পরিণাম ব্যাপক এবং তুমি যখন এসবের জন্য প্রস্তুত নও, ওইসময় এগুলোর আঘাত আসতে পারে তোমার ওপর। তুমি যদি বুঝতে পারো এসব কঠিন মুহূর্ত তোমার জীবনে আসবে, তাহলে এ জন্য প্রস্তুতি নাও এবং যোদ্ধার মতো এগুলোর মুখোমুখি হয়ে ফিরে এসো বিজয়ী বেশে।

এসব মুহূর্তের মোকাবিলায় তোমাকে সাহসী হতে হবে। একরাতের আনন্দের জন্য নিজের ভবিষ্যত জলাঞ্জলি দিয়ো না। কিংবা এক সপ্তাহের উত্তেজনা অথবা কারও ওপর প্রতিশোধ নেয়ার রোমাঞ্চ উপভোগ করতে গিয়ে নিজের সম্ভাবনাময় সময় নষ্ট করো না। যাতে পরবর্তীতে তোমাকে পস্তাতে হবে বা অনুশোচনা করতে হবে।

সাফল্যের সাধারণ উপাদান

আগের কাজ আগের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সবার আগে আসে ডিসিপ্লিনের কথা। তোমার সময় ম্যানেজ করার জন্য ডিসিপ্লিন দরকার। ভয়কে জয় করতে ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন। চাপ সহ্য করতেও ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন রয়েছে। আলবার্ট ই গ্রে নামে এক লোক বহু বছর গবেষণা করেছেন জানতে যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের ভেতরে বিশেষ কী গুণ বা উপাদান ছিল। তিনি দেখেছেন, সফল মানুষরা অনেক সময় নিজেদের অপছন্দের কাজগুলোও দাঁতে দাঁত পিষে করে গেছেন। কেন তাঁরা এসব করেছেন? কারণ তারা জানতেন এসব জিনিস তাঁদেরকে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

তোমার কি মনে হয় একজন কনসার্ট পিয়ানোবাদক প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিয়ানো বাজিয়ে খুব আনন্দ লাভ করেন? না, করেন না।

আমি একটি লেখা পড়েছিলাম, যেখানে জনৈক আমেরিকান কুস্তিগীরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মৃতিময় দিন কী? তিনি জবাব দেন, যেদিন তাঁর প্রাকটিস থাকতো না, ওইদিন ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে স্মৃতিময় দিন। তিনি প্রাকটিস করতে খুবই অপছন্দ করতেন। কিন্তু আরও বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ প্রাকটিস তাঁকে সহ্য করতেই হতো।

শেষ কথা

আমরা ৭টি অভ্যাস নিয়ে হাজারও মানুষের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছি জানতে যে, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কোনটি? সবাই কী জবাব দিয়েছিল, জানো? ৩নং অভ্যাস। কাজেই এটি নিয়ে কাজ করতে গেলে হতাশ হয়ো না।

৩নং অভ্যাস কীভাবে শুরু করবে বুঝতে না পারলে ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করো। ওগুলো তোমাকে অভ্যাসটি শুরু করতে সাহায্য করবে।

ছোট ছোট পদক্ষেপ

১) এক মাসের জন্য একটি প্ল্যান তৈরি করো এবং সেটিতে লেগে থাকো।

২) কীসে তোমার সবচেয়ে সময় নষ্ট হয় তা চিহ্নিত করো। তোমার কি প্রতিদিন ফোনে দুই ঘণ্টা কথা বলার সত্যি দরকার আছে, কিংবা সারারাত ইন্টারনেট ব্রাউজ করা অথবা টিভিতে নাটক দেখা?

লেখো-

আমার সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট হচ্ছে যাতে—

৩) কেউ তোমাকে কিছু বললেই কি তুমি তার কাজটি করে দিতে মুখিয়ে থাকো? যদি এমন অভ্যাস থাকে তাহলে এটা দূর করো এবং আজ থেকে 'না' বলার সাহস সঞ্চয় করো।

৪) এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার যদি কোনো পরীক্ষা থাকে, কুঁড়েমি কোরো না, ভেবো না যে পরশু পড়তে বসবে। প্রতিদিনই একটু একটু করে পড়ো।

৫) একটি কাজ করা তোমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ সেটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গড়িমসি করছো, এরকম কোনো কাজের কথা ভাবো এবং কাজটি এ সপ্তাহের মধ্যেই সেরে ফেলো।

আমি যে কাজটি অনেকদিন ধরে করবো ভেবেও করা হচ্ছে না—

৬) আগামী সপ্তাহে জরুরি যে কাজগুলো করবে তার একটা তালিকা করে ফেলো। এখন অন্য কাজ বাদ দিয়ে এগুলো একটি একটি করে সারো।

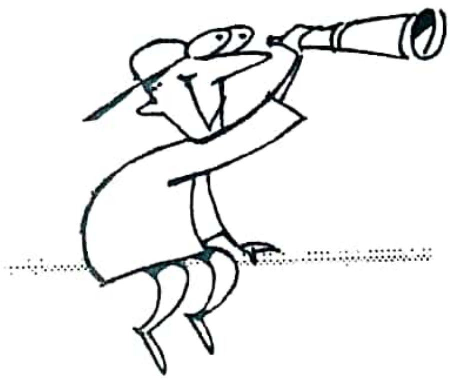
৭) যে ভয়টি তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে সেটি চিহ্নিত করো। সিদ্ধান্ত নাও কমফোর্ট জোনের বাইরে গিয়ে এ ভয়টাকে আর পাত্তা না দিয়ে কাজটি করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবে।

যে ভয়টি আমাকে টেনে ধরে রাখে—

৮) তোমার ওপরে অন্যদের চাপ বা প্রেশার কতোটুকু? যে লোকটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি চাপ দিচ্ছে তাকে চিহ্নিত করো। নিজেকে প্রশ্ন করো, 'আমি যা করতে চাই তা কি আমি করছি, নাকি কাজটা ওরা আমাকে দিয়ে করাতে চাইছে?'

আমাকে যে লোকটি সবচেয়ে বেশি চাপ দিয়ে থাকে—

রিলেশনশিপ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট



আমরা এর আগে পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ১, ২ ও ৩নং অভ্যাস সম্পর্কে জেনেছি। আর এ অধ্যায়ে আমরা শিখবো রিলেশনশিপ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে। সম্পর্ক গড়ে তুলতে সবার আগে নিজেকে আয়ত্ব বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে এজন্য তোমার নিখুঁত হওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু উন্নতি করলেই চলবে।

সাফল্য নিজের জন্য যেমন তেমনি অপরের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ বেশিরভাগ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো *তুমি কী বা কে?*

আমি রিলেশনশিপ ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে সংক্ষেপে বলবো RBA এর আগে আমরা PBA বা পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি। যেখানে তোমার ভেতরকার আস্থা এবং আত্মবিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। একইভাবে যার বা যাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রয়েছে তাতে আস্থা এবং বিশ্বাসের পরিমাণ কতোটুকু সেটি বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি।

RBA-র তুলনা করা যেতে পারে, ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা চলতি সঞ্চয়ের সঙ্গে। তুমি ডিপোজিটের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারো আবার উইথড্র করে তাকে দুর্বল করেও তুলতে পারো। দীর্ঘ সময় ধরে চলা একটি স্থিতিশীল ডিপোজিটের ফলাফল হলো, একটি শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক।

যদিও মিল রয়েছে তবু RBA ফিন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে অন্তত তিনটি দিক থেকে আলাদা বলেছে আমার সহকর্মী জুডি হেনরিকস। সে দেখিয়ে দিয়েছে :

১) তুমি ব্যাংকে একটি বা দুটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারো তবে RBA খোলা যাবে যার সঙ্গে সাক্ষাত হবে তার সঙ্গেই। ধরো কোনো পাড়া বা মহল্লায় তুমি নতুন এসেছো। এখন তুমি অপরিচিত যাকে দেখেই 'হ্যালো' বলছো, সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে তোমার একটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেল। তুমি যদি তাকে অগ্রাহ করো বা এড়িয়ে চলো সেক্ষেত্রেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। তবে সেটি নেতিবাচক অ্যাকাউন্ট। এ ধরনের অ্যাকাউন্ট খুলে কোনো লাভ হবে না।

২) কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুললে সেটি তুমি যে কোনো সময়ে বন্ধ করতে পারবে কিন্তু কারও সঙ্গে RBA অ্যাকাউন্ট খুললে তা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

৩) চলতি হিসাবে ১০ টাকা মানে ১০ টাকাই। কিন্তু RBA তে ডিপোজিট বাষ্প

হয়ে উড়ে যায়, উইথড্রয়ালের রূপান্তর ঘটে পাথরে। এর অর্থ তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শগুলোর ক্ষেত্রে ছোট ছোট ডিপোজিট অনবরত চালিয়ে যাবে।

তো কীভাবে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায় কিংবা ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগানো সম্ভব?

কাজটি সহজ। একবারে একটি ডিপোজিট করবে। তোমাকে আস্ত হাতি খেতে দিলে নিশ্চয় একবারে পুরোটা সাবাড় করতে পারবে না। এককে কামড়ে খেতে হবে। তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই।

একবার আমি একদল কিশোর-কিশোরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমার RBA তে সবচেয়ে সেরা ডিপোজিট কে, কীভাবে তৈরি করেছো?' তাদের জবাব ছিল নিম্নরূপ:

* আমার পরিবারের ডিপোজিট আমাকে শক্তিশালী করেছে।

* যখন কোনো বন্ধু, শিক্ষক বা কোনো প্রিয়জন বলে 'তোমাকে দারুণ লাগছে' কিংবা 'দারুণ কাজ করেছো' সেসবই আমার জন্য বিরাট ডিপোজিট।

* আমার বন্ধু একবার আমার জন্মদিনে ব্যানার বানিয়েছিল, ওটাই ছিল আমার সেরা ডিপোজিট।

* আমাকে নিয়ে যখন অন্যের কাছে গর্ব করা হয়।

* আমি ভুল করার পরেও যখন তারা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, ভুলে গেছে, সাহায্য করেছে, ভালোবেসেছে।'



* আমি আমার লেখা কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালে আমার বন্ধু কবিতাগুলোর খুব প্রশংসা করে বলেছিলো, আমার বই লেখা উচিত।

* আমার ভাই সবসময় ওর বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে হকি খেলা দেখতে নিয়ে যায়।

* আমার খুব ভালো চারজন বন্ধু আছে। আমরা যখন একত্রে থাকি খুব ভালো লাগে, আর ওরা সবসময় আমাকে খুশিতে রাখার চেষ্টা করে।

* যখন ক্রিস বলে, 'হাই, কেমন আছো, ডিয়ার?' ওর কথার ভঙ্গিটি এতো চমৎকার যে আমি উজ্জীবিত হই।

* আমার এক বন্ধু ছিল সে বিশ্বাস করতো, আমি খুব সিনসিয়ার। আমাকে কেউ ওভাবে বুঝতে পেরেছে সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

দেখতেই পাচ্ছো কতো রকমের ডিপোজিট রয়েছে। তবে নিচে ছয়টি ডিপোজিটের কথা বলা হলো, যেগুলো সবসময় কাজ করে। তবে প্রতিটি ডিপোজিটের বিপরীতে উইথড্রয়াল ডিপোজিটও রয়েছে।

RBA ডিপোজিট	**RBA উইথড্রয়াল**
প্রতিশ্রিুতি রক্ষা	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ
ছোট ছোট দয়ালু কাজ করা	নিজের মধ্যে ডুবে থাকা
বিশ্বস্ত থাকা	গসিপ করা এবং বিশ্বাস ভঙ্গ
লোকের কথা শোনা	লোকের কথা না শোনা
বলা যে তুমি দুঃখিত	আচরণে ঔদ্ধত্ব হওয়া
প্রত্যাশাগুলো পরিস্কারভাবে তুলে ধরা	ভুয়া প্রত্যাশা সাজিয়ে রাখা

প্রতিশ্রুতি রক্ষা

ছোট ছোট প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা যায়। তুমি যা করবে বলেছো তা অবশ্যই তোমার করা উচিত। তুমি যদি তোমার মাকে বলো, আজ সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফিরবে কিংবা তাকে ঘরকন্যার কাজে সাহায্য করবে, তাহলে অবশ্যই তোমার এ কথা রাখা উচিত। এভাবে তুমি তৈরি করতে পারবে ডিপোজিট। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে জানিয়ে দিও। এভাবে বলতে পারো, 'দুঃখিত, বোন, আজ রাতে আমি তোমাদের নাটকে হাজির থাকতে পারবো না। জানতাম না আমার রাগবি ম্যাচ আছে। তবে কাল নিশ্চয় যাবো।' তুমি যদি সত্যি কথা বলো এবং সবসময় প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টা করো, তাহলে দু'একটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে লোকে ঠিক বুঝে নেবে তুমি ইচ্ছে করে কাজটি করনি, বিপদে পড়ে করেছো।

তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে তোমার RBA-র পরিমাণ যদি কম থাকে, প্রতিশ্রুতি রক্ষার মাধ্যমে তা গড়ে তোলার চেষ্টা করো। কারণ তোমার বাবা-মা তোমাকে বিশ্বাস করেন। কাজেই তাঁদের সঙ্গে RBA গড়ে তুলতে কোনো সমস্যা হবে না।

ছোট ছোট দয়ালু কাজ করা

তোমার খুব মন খারাপ। আজ যে কাজে হাত দিচ্ছো সেটাই ব্যর্থ হচ্ছে। তুমি অত্যন্ত হতাশা বোধ করছো। এমন সময় কেউ যদি খুব মিষ্টি করে কিছু বলে, তোমার মন নিশ্চয় ভালো হয়ে যাবে? মাঝেমধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছু বিষয়—একটি হ্যালো, একটি দয়ালু চিঠি, একটু হাসি, একটু প্রশংসা, একটু জড়িয়ে ধরা—দারুণভাবে অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। যদি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাও, ছোট ছোট এ কাজগুলো করো। কারণ সম্পর্কের মাঝে ছোটগুলোই বড় কাজ করে। মার্ক টোয়েন বলেছেন, 'চমৎকার একটি প্রশংসা আমার তিন মাসের চলার পাথেয়।'

'জাপানী প্রবাদ রয়েছে, 'একটি দয়ালু কথা তিনটি শীতের মাসকে উষ্ণ করে তুলতে পারে।

বিশ্বস্ত হও

RBA-র অন্যতম বৃহৎ ডিপোজিট হলো, অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। তবে কেউ সামনে থাকলেই যে তার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাতে হবে তা নয়, পেছনে থেকেও এটি দেখানো যায়। তুমি কারও আড়ালে কথা বলে আসলে নিজেরই ক্ষতি করছো।

প্রথমত, তোমার মন্তব্য যারা শুনছে তারা কিন্তু তোমাকে পছন্দ করতে পারছে না। তুমি যদি শোনো, গ্রেগের অনুপস্থিতিতে আমি তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছি, তার মানে কি এ নয় যে, যখন তুমি উপস্থিত থাকবে না, তখন তোমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলবো না? বলবো। আমার অভ্যাসই হলো কুৎসা রটানো।

দ্বিতীয়ত, তুমি যখন কারও বিরুদ্ধে বাজে কথা বলছো কিংবা গসিপ করছো, তাহলে যার সম্পর্কে কুৎসা রটানো হচ্ছে, তার কাছ থেকে কিন্তু অদৃশ্য উইথড্রয়াল হয়ে যাচ্ছো। তোমার কি এমনটি কখনও মনে হয় না যে, তুমি যেমন লোকের আড়ালে তাদেরকে নিয়ে বাজে কথা বলো, তারাও তোমার আড়ালে তেমনি তোমাকে গালাগাল দেয়? তুমি হয়তো সেই গালাগাল শুনতে পাওনি কিন্তু

অনুভব করতে পারবে। এটি অদ্ভুত শোনালেও সত্যি। তুমি লোকের সামনে মিষ্টি কথা বলছো, আর তারা পেছন ফিরলেই বাজে কথা রটাচ্ছো, ভেবো না যে এটা তারা টের পায় না। যে কোনোভাবেই হোক তারা ঠিক বুঝে নেয়।

টিনেজারদের মধ্যে গসিপিং একটি মস্ত সমস্যা। বিশেষ করে, মেয়েদের মধ্যে। ছেলেরা হাতাহাতি করে কিন্তু মেয়েরা গালি-গালাজ করে, তবে অপরকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। গসিপ করা হয় নিরাপত্তাহীনতা, ভয় কিংবা হুমকি থেকে। যেসব মানুষ অন্যদের থেকে একটু ভিন্ন, আত্মবিশ্বাসী কিংবা অন্য যে কোনোভাবে সবার থেকে আলাদা, এদেরকেই গসিপ করার জন্য বেছে নেয় গসিপাররা।

গুজব-গুঞ্জন অন্য যে কোনো বাজে অভ্যাসের চেয়ে অনেক বেশি সম্পর্ক এবং সম্মান নষ্ট করে দিয়েছে। আমার বন্ধু অ্যানি এ গল্পটি আমাকে বলে যে, গসিপের বিষয় কতো ভয়াবহ।

সেবার FCSE-র সামারে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড টারা এবং আমি দুটি ছেলের সঙ্গে ডেট করছিলাম। ছেলে দুটি পরস্পরের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। আমরা আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড। চারজনে একত্রিত হলে দারুণ জমে উঠতো আড্ডা। একবার উইকএন্ডে টারা এবং আমার বয়ফ্রেন্ড তাদের পরিবারের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যায়। টারার বয়ফ্রেন্ড উইল আমাকে ফোন করে বলে, 'টারা এবং স্যাশ যেহেতু শহরের বাইরে এবং আমাদেরও কিছু করার মতো কাজ নেই, চলো, দু'জনে মিলে একটা সিনেমা দেখে আসি।'

যেহেতু আমরা একে অপরের খুব ভালো বন্ধু এবং উইল সেটা জানতো, আমিও জানতাম, তাই ভাবলাম একসঙ্গে ছবি দেখলে সমস্যা নেই। কিন্তু সিনেমা হলে আমাদেরকে কেউ দেখে ফেলে এবং বিষয়টির ভুল ব্যাখ্যা করে। আমরা থাকতাম ছোট একটি শহরে, আর সেখানে গসিপ বাতাসের বেগে ছড়ায়। আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডকে কিছু বলার আগেই গুজবটি রটে যায়। তখন আর এ গুজবের রাশ টেনে ধরার কোনো উপায় ছিল না। আমি ওদেরকে 'হাই' বললেও ওরা জবাব দিতো না। কঠিন করে রাখতো মুখ। আমরা কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছিলাম না। আমাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড এবং বয়ফ্রেন্ড ছড়িয়ে পড়া নোংরা গসিপটি বিশ্বাস করেছি। এবং এটা তাদের ক্রোধের আগুনে ঘি ঢেলেছিল। বিশ্বস্ততা নিয়ে সেই গ্রীষ্মে আমি মস্ত একটি শিক্ষা পেয়েছিলাম, যার কোনোদিন ভুলবো না। আজতক আমার বেস্টফ্রেন্ড আমাকে বিশ্বাস করে না।

ওপরের গল্পটি শুনে আমার মনে হয়েছে পরস্পরের প্রতি সামান্য বিশ্বস্ততা থাকলে ঘটনা এতোদূর গড়াতো না। তো মানুষ বিশ্বস্ত হতে পারে কীভাবে?



বিশ্বস্ত মানুষ গোপন কথা গোপন রাখে

লোকে যখন তোমাকে বিশ্বাস করে কিছু শেয়ার করে এবং বলে 'এটা তুমি এবং আমি ছাড়া কেউ যেন না জানে' তখন এ কথাটি গোপন রাখাই শ্রেয়। এটি পাঁচ কান করা মোটেই সমীচীন হবে না।

বিশ্বস্ত মানুষ গসিপ এড়িয়ে চলে

তুমি কি কোনো গ্রুপ চ্যাট থেকে কখনও কেটে পড়েছো এই ভয়ে কেউ হয়তো তোমাকে নিয়ে গসিপ শুরু করতে পারে? কেউ যেন তোমাকে নিয়ে এসব ভাবার সুযোগ না পায়। জলাতঙ্ক রোগের মতো এড়িয়ে চলবে গসিপ। অন্যদের নিয়ে ভালো ভালো চিন্তা করবে এবং তাদেরকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখবে। তার মানে এ নয় যে, তুমি কাউকে নিয়ে সমালোচনা করবো না। করবে। তবে গঠনমূলকভাবে। মনে রেখো, শক্তিশালী মন আইডিয়া নিয়ে কথা বলে; দুর্বল মন কথা বলে লোকদের নিয়ে।

বিশ্বস্ত মানুষ অন্যদের গুণগান করে

পরবর্তীতে যখন কারও সম্পর্কে গসিপ করতে শুনতে কোনো গ্রুপ চ্যাট, সেখানে না থাকার চেষ্টা করো অথবা সেই লোকটির গুণগান করো। তাতে লোকের প্রশংসাই পাবে। এ প্রসঙ্গে বেটির গল্পটি শোনা যাক:

একদিন ইংরেজি ক্লাসে আমার বন্ধু ম্যাট একটি মেয়ে সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতে শুরু করে। মেয়েটি ছিল আমার পড়শী। যদিও আমাদের মধ্যে

কখনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ম্যাটের বন্ধু মেয়েটিকে ডান্স করতে নিয়ে গিয়েছিলো, তাই সে মেয়েটিকে 'উন্নাসিক', ফালতু মেয়েছেলে' বলে সম্বোধন করছিল।

আমি ওর দিকে ফিরে বলি, 'এসব কী বলছো তুমি! কিম আর আমি একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি এবং আমি জানি ও খুব মিষ্টি একটি মেয়ে।' এ কথা বলে আমি নিজেই খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি আসলে ওর সঙ্গে খাতির করতে চাইছিলাম। কিম যদিও জানতো না ওর আমি প্রশংসা করেছি তবে ওর প্রতি আমার মনোভাবের পরিবর্তন হওয়ায় আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠি।

ম্যাট এবং আমি এখনও ভালো বন্ধু। আমার মনে হয় ও জানে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আমার ওপরে ভরসা করা চলে।

গসিপ পাত্তা না দিতেও সাহসের প্রয়োজন হয়। তবে প্রাথমিক বিব্রত ভাবটি কাটানোর পরে লোকে কিন্তু তোমার প্রশংসাই করবে। কারণ তারা জানে, তুমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিশ্বস্ত। আমি আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি। ফলে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটি সারাজীবনের থেকে গেছে।

শোনা

অপরের RBA তে সেরা ডিপোজিটের অন্যতম হতে পারে অন্যদের কথা শোনা। কেন? কারণ বেশিরভাগ মানুষই কিছু শুনতে চায় না। তাছাড়া শ্রবণের মাধ্যমে মনের ক্ষত দূর হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে জেসিকার গল্পটি তার মুখে শোনা যাক :

শুরুতে বাবা-মা'র সঙ্গে আমার আত্মিক যোগাযোগের একটা সমস্যা হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা আমার কথা শুনতে চাইতেন না, আমি তাঁদের কথা কানে তুলতাম না। ব্যাপারটি ছিল অনেকটা 'আমি ঠিক, তুমি ভুল' ধরনের। আমি দেরিতে বাড়ি ফিরতাম, অনেক রাতে ঘুমাতে যেতাম এবং সকালে নাশতা করে কারও সঙ্গে বাতচিত না করে চলে যেতাম স্কুলে।

আমার চেয়ে বয়সে বড় এক কাজিনের কাছে একদিন গিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' তারপর গাড়ি নিয়ে শহরের বাইরে চলে গেলাম যাতে একাকী কথা বলতে পারি। সেখানে বসে আমি আড়াই ঘণ্টা মন উজাড় করে ওকে আমার সমস্ত কথা বললাম। চিৎকার করলাম। কাঁদলাম। ও শুধু আমার কথা শুনে গেল। আমার কাজিন ছিল আশাবাদী ধরনের মেয়ে। সে সব শুনে আমাকে বললো, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার বাবা-মা'র সঙ্গে কথা

করার পরামর্শ দিল। বললো আমার উচিত হবে আমার বাবা-মা'র আস্থা অর্জন করা।

আমি এরপর আমার বাবা-মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করি। তারপর থেকে আমাদের আর ঝগড়া ঝাঁটি হয়নি এবং আমরা বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছি।

খাদ্য গ্রহণের মতো মানুষের কথা শোনার লোকেরও প্রয়োজন। আর তুমি যদি মনোযোগী শ্রোতার মতো তাদের কথা শোনো, তুমি দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারবে।

বলো যে তুমি দুঃখিত

কারও সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করলে, ওভাররিয়্যাক্ট করে ফেললে কিংবা বোকার মতো কোনো ভুল করে বসলে যদি 'সরি' চাও তাহলে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দ্রুত ভরে যাবে। তবে বন্ধুকে 'আমি ভুল করেছি,' 'আমি ক্ষমা চাইছি' বা 'আমি দুঃখিত' বলতে সাহস লাগে। বিশেষ করে নিজের বাবা মা'র কাছে ভুল স্বীকার করা তো খুবই কঠিন কাজ। সতেরো বছরের লেনা বলেছে:

অভিজ্ঞতা থেকে জানি ক্ষমার ব্যাপারটি আমার বাবা'মা'র কাছে কী অর্থ বহন করে। আমি যদি নিজের ভুল স্বীকার করে তাদের কাছে ক্ষমা চাই, তাঁরা সব কিছুর জন্য ক্ষমা করে দিতে রাজি। তবে কাজটি অত সহজ নয়।

এক রাতে একটি ব্যাপারে মা'র সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়েছিল। আমি এমন একটা কাজ করেছিলাম যাতে মায়ের সম্মতি ছিল না মোটেই। তবে আমি ব্যাপারটি বেমালুম অস্বীকার যাই এবং উল্টো এমন ভাব করি, যেন বাবা-মা'ই সবকিছুর জন্য দায়ী। আমার মায়ের মুখের ওপর দড়াম করে লাগিয়ে দিই দরজা।

নিজের ঘরে ঢোকামাত্র আমার খারাপ লাগতে শুরু করে। আমি বুঝতে পারি ভুলটা আমারই এবং মায়ের সঙ্গে বড্ড রূঢ় আচরণ করে ফেলেছি।

ভাবছিলাম আমি কি রুমে শুয়ে থাকবো, নাকি দোতলায় গিয়ে মা'র কাছে ক্ষমা চাইবো? মিনিট দুই চুপচাপ বসে ভাবলাম তারপর সোজা চলে গেলাম মায়ের কাছে। তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং আমার আচরণের জন্য ক্ষমা চাইলাম। আমার জীবনের সেরা কাজটি সেদিন করেছিলাম। এরকম কোনো ব্যাপার যেন ঘটেইনি এরকম ভাবতে আমি বেশ হালকা বোধ করতে থাকি এবং খুশি মনে নিজের কাজে মন দিই।

যাদের সঙ্গে তুমি খারাপ ব্যবহার করেছো কিংবা তোমার আচরণে কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে তাকে গিয়ে 'সরি' বলতে দ্বিধা করো না। নিজের অহংবোধ বিসর্জন দিয়ে এবং মনে সাহস এনে ক্ষমা চাইলে। দেখবে এজন্য পরে কতো ভালো লাগছে। ক্ষমা চাইলে যার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয় সেই মানুষটি দুর্বল হয়ে পড়ে। কেউ অপমানিত হলে তাদের অপমানবোধ তরবারির মতো তীক্ষ্ণ ও ধারালো হয়ে ওঠে। তবে ক্ষমা চাইলে সেই তরবারি তারা নামিয়ে নেয়।

প্রত্যাশাগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরো

তুমি যখন কোনো নতুন চাকরিতে ঢুকবে, কিংবা নয়া সম্পর্ক গড়ে তুলবে, নিজের প্রত্যাশাগুলো পরিস্কারভাবে তুলে ধরতে ভুল করবে না।

ধরো জ্যাকুলিন বললো, 'তোমার সঙ্গে চমৎকার সময় কাটলো, জেফ। আবার পরের সপ্তাহে দেখা হবে।' এ কথা দিয়ে জ্যাকুলিন আসলে বলতে চেয়েছি, 'সুন্দর একটা সময় কাটলো। এসো, এখন শুধু বন্ধু হই।' কিন্তু জ্যাকুলিন যেহেতু ফলস প্রত্যাশার কথা বলেছে, তাই জেফ তাকে পরের সপ্তাহে আবার ডেটিংয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। আর জ্যাকুলিন তাকে প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করে বলে, 'পরের সপ্তাহে দেখা যাবে' জ্যাকুলিন যদি শুরুতেই তার কথাবার্তায় সৎ থাকতো, তাহলে কিন্তু তাকে এতো ঝামেলা পোহাতে হতো না।

তোমার বস হয়তো বলতে পারে, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তোমাকে আমার দরকার অমুক কাজটি করে দেয়ার জন্য।'

তুমি হয়তো জবাব দিলে, 'আমি দুঃখিত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি থাকতে পারবো না। কারণ ওই সময় আমার শিশু ভাইটিকে আমার দেখাশোনা করতে হয়।

'তোমাকে চাকরি দেয়ার সময় এ কথাটি বললেই পারতে। এখন আমি কী করবো?'

এভাবে সরাসরি কথা বলে অর্জন করো আস্থা এবং নিজের প্রত্যাশাগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরো।

ছোট ছোট পদক্ষেপ

প্রতিশ্রুতি রক্ষা

১) আগামীতে যখন রাতে বাড়ির বাইরে যাবে, বাবা-মাকে বলে যাবে তুমি কখন বাসায় ফিরছো।

২) আজ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়ার আগে চিন্তা করবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবে কিনা।

ছোট ছোট দয়ালু কাজ করো

৩) এ সপ্তাহে কোনো ভিখিরির জন্য কিছু খাবার কিনে দিও।

৪) যে মানুষটিকে অনেকদিন ধরে ধন্যবাদ দিতে চাইছো কিন্তু দেয়া হয়ে ওঠেনি, তাকে একটি 'থ্যাংক ইউ নোট' লিখে দাও।

যাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই—

বিশ্বস্ত হও

৫) গসিপ থেকে দূরে থাকো।

৬) একটি পুরোদিন অন্যদের ব্যাপারে শুধু ইতিবাচক চিন্তা করবে।

শোনা

৭) আজ বেশি কথা বোলো না। শুধু শুনে যাও।

৮) পরিবারের এমন কোনো সদস্যকে বেছে নাও, যার কথা তুমি কখনোই শুনতে চাওনি বা পাত্তা দাওনি। হতে পারে সে তোমার কোনো ছোট ভাই-বোন বা বড় কেউ।

বলো দুঃখিত

৯) আজ রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এমন কাউকে 'সরি' বলে চিঠি লেখো, যাকে পূর্বে একটা অপমান করেছিলে।

পরিষ্কার প্রত্যাশা

১০) এমন একটি পরিবেশের কথা ভাবো, যেখানে তোমার এবং তোমার লোকের প্রত্যাশা ভিন্ন। কীভাবে প্রত্যাশা অভিন্ন করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করো।

তাদের প্রত্যাশা–

আমার প্রত্যাশা–

অভ্যাস-৪

ভাবো দুই জনেই জিতবে

জীবন একটা বুফে



আমরা কী জন্য বেঁচে আছি? যদি জীবনটাকে একে অপরের জন্য
একটু সহজ করে তুলতে না পারি?

–জর্জ এলিয়ট, লেখক

আমি একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস ডিগ্রি নিয়েছিলাম যেটি কুখ্যাত ছিল তার 'forced curve' মার্কিং পলিসির জন্য। প্রতিটি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯০ জন এবং প্রতি ক্লাসে ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ৯ জন ছাত্র বা ছাত্রীকে *ক্যাটাগরি থ্রি* পেতে হতো। ক্যাটাগরি থ্রি মানে তুমি ফেল। ক্লাসে যত ভালো বা খারাপ পারফরমেন্সই করো না কেন, নয়জন ক্লাসে ফেল করতোই। আর খুব বেশি কোর্সে ফেল করলে তোমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দেবে। চাপটা ছিল সাংঘাতিক।

সমস্যা হলো ক্লাসের সকলেই ছিল দারুণ স্মার্ট। কাজেই প্রতিযোগিতাও ছিল ভয়ানক। আমি ঠিক করলাম, ভালো নম্বর পাবার বদলে আমার লক্ষ্য হবে ওই নয়জন ছাত্রের মধ্যে আমি যেন না থাকি। খেলায় জিতবার বদলে আমি চেয়েছি যাতে খেলায় না হারি। এ প্রসঙ্গে আমার একটি গল্পের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। দুই বন্ধুকে একটি ভল্লুক তাড়া করেছিল। একজন অপরজনের দিকে ফিরে বললো, 'আমি মাত্রই বুঝতে পারলাম, দৌড়ে ভল্লুকটাকে হারানোর প্রয়োজন আমার নেই; তোমাকে দৌড়ে হারানো দরকার।'

একদিন ক্লাসে বসে আমি সবার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এদের মধ্যে কোন্ নয়জন রয়েছে যারা আমার চেয়েও বোকা। একজন নির্বোধের মতো একটি উক্তি করে বসলে আমি ভাবলাম, 'এই তো পেয়েছি। এ ছোকরা নির্ঘাত ফেল করবে। আর বাকি রইল আটজন।'

সেমিনারে আমি মাঝে মাঝে আমার সেরা আইডিয়াগুলো বলতে চাইতাম না, পাছে কেউ আমার আইডিয়া চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়! এসব দুশ্চিন্তা ভেতরে ভেতরে আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো এবং মনটাও ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছিল। সমস্যা হলো, আমি হার-জিতের কথা ভাবছিলাম। আর হারজিতের কথা ভাবলে তোমার মন নেতিবাচক চিন্তায় প্লাবিত হবেই। তবে একটি ভালো উপায়ও ছিল। এটি হলো ৪ নম্বর অভ্যাস। ভাবো দুই জনেই জিতবে।

ভাবো দু'পক্ষই জিতবে, জীবনের প্রতি একটি দৃষ্টিভঙ্গি, মনের একটি



মানসিক কাঠামো, যেটি বলে আমি জিততে পারবো, তুমিও পারবে। তুমি বা আমি একা নই, দু'জনেই জিতবো।

দু'জনেই জিতবে—এ ভাবনাটি একে অন্যের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করার ভিত্তিমূল। এটির শুরু আমরা সবাই সমান এরকম ধারণা থেকে। আমরা কেউ কারো চেয়ে ছোট বা বড় নই এবং তা হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

এখন তোমরা হয়তো বলতে পারে, 'বাস্তববাদী হও, শন' এভাবে বললেই হয় না। এটি নিষ্ঠুর পৃথিবী। এখানে পদে পদে প্রতিযোগিতা। সবাই সবসময় জিততে পারে না।'

আমি তোমাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। জীবন আসলে এরকম নয়। জীবন প্রতিযোগিতার নয়, একে অন্যকে ল্যাং মেরে এগিয়ে যাওয়ার নামও জীবন নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা কিংবা স্কুলে এরকম প্রতিযোগিতা চলতে পারে, কিন্তু ওগুলো তো আমাদেরই তৈরি কতোগুলো প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সম্পর্ক ওভাবে যায় না। তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারো, 'সম্পর্কে কার জিতবার কথা বলছো তুমি? তোমার নাকি তোমার বন্ধুর?'

তাহলে এসো 'ভাবো দুইজনেই জিতবে' শিরোনামের এই অদ্ভুত আইডিয়াটি আবিষ্কার করি।

হার-জিত : একটি টোটেম পোল

'মম, আজ রাতে বড় একটি ম্যাচ আছে। খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য আমার গাড়িটা লাগবে।'

'সরি, মেরি, কিন্তু আজ রাতে আমাকে সুপার মার্কেটে যেতে হবে। তোমার বন্ধুদের গাড়িতে যাও।'

'কিন্তু মম, আমার বন্ধুদের কাছে সবসময় লিফট চাইতে ভালো লাগে না। অস্বস্তি লাগে।'

'শোনো, তুমি গত এক সপ্তাহ ধরে অভিযোগ করে আসছো, বাড়িতে খাবার নেই বলে। এখন আমাকে বাজারে যেতেই হবে। দুঃখিত।'

'তুমি মোটেই দুঃখিত নও। যদি দুঃখিত হতে তাহলে গাড়িটি আমাকে নিয়ে যেতে দিতে। তুমি খুব খারাপ। আমার প্রতি মোটেই খেয়াল নেই তোমার।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে যাও। গাড়িটা নাও। তবে কাল যখন খাওয়ার মতো কিছু পাবে না, আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান কোরো না।'

এ ঘটনায় মা হেরেছেন, মেরি জিতেছে। একে বলে হার-জিত। কিন্তু মেরি কি সত্যি জিতলো? হয়তো এবারে জিতেছে কিন্তু মা কী ভাবলেন? পরেরবার কি তিনি মেরিকে এরকম কোনো সুযোগ দেবেন? শেষ পর্যন্ত কী হবে তা-ই ভাবা উচিত।

হার-জিত হলো জীবনের প্রতি একটি অ্যাটিটিউড বা ধারণা, যা বলছে সাফল্যের পাইটি এতো বিশাল যে, তুমি যদি বড় একটি অংশ পেয়ে যাও তো আমার ভাগ্যে জুটবে ছোট্ট টুকরো। কাজেই আমি নিশ্চিত হয়ে নেবো, যাতে আমার টুকরোটা আগে পেয়ে যাই এবং সেটা যেন আকারে তোমার চেয়ে বড় হয়। হার-জিত হলো প্রতিযোগিতামূলক। একে আমি আখ্যায়িত করেছি টোটেম পোল সিনড্রোম বলে। 'আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই খুঁটিতে, (টোটেম পোল) তোমার চেয়ে উঁচুতে উঠতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছুই গ্রাহ্য করবো না।' সেরা হওয়ার নেশায় এ খেলায় সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা সবই খেলা হয়ে যায়।

হার-জিতের ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, কাজেই এ নিয়ে মন খারাপের কিছু নেই। বিশেষ করে পশ্চিমে যাদের জন্ম। এশীয়রা আবার তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক বেশি সহযোগিতামূলক।

আমার কথা প্রমাণ করতে রডনির গল্প বলা যেতে পারে।

রডনি ছিল সাধারণ একটি বালক। প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা তার হয় নয় বছর বয়সে, যখন সে স্কুলের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় নাম লেখায় এবং শীঘ্র

আবিষ্কার করে পুরস্কার দেয়া হয় শুধু প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের। রডনি কোনো খেলায় জিততে পারেনি তবে অংশ নিতে পেরেছে বলেই সে খুশি। এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার কারণে সে একটি পুরস্কারও পেয়েছিল। যদিও তার বেস্ট ফ্রেন্ড তাকে বলেছে, ওই পুরস্কার কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। কারণ প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে সবাইকে অমন সান্ত্বনা পুরস্কার দেয়া হয়।'

সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ার সময় রডনিকে তার বাবা-মা লেটেস্ট স্টাইলের জিনস এবং জুতো কিনে দিতে পারেননি। কাজেই তাকে পুরানো জামাকাপড় এবং জুতোই পড়তে হয়েছে। সে দেখতো তার বড়লোক বন্ধুরা দামী দামী পোশাক পরে আসছে। রডনি তখন হীনমন্যতায় ভুগতো।

স্কুলে রডনি ভায়োলিন শিখতে শুরু করে এবং অর্কেস্ট্রায় যোগ দেয়। সে বিতৃষ্ণা নিয়ে জানতে পারে, শুধুমাত্র একজনকে ফার্স্ট প্রাইজ দেয়া হবে। রডনি দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে হতাশ হলেও ভেবেছে তাকে অন্তত: তৃতীয় হতে হয়নি।

বাড়িতে রডনি তার মায়ের প্রিয় 'খোকা' ছিল অনেকদিন। কিন্তু এখন তার ছোট ভাই, স্পোর্টসে অনেকগুলো পুরস্কার জেতার দৌলতে মায়ের আদর পাচ্ছে বেশি। রডনি স্কুলে কোমর বেঁধে পড়ালেখা শুরু করে দেয় এ আশায় যে, যদি পরীক্ষায় ভালো করতে পারে, তাহলে হয়তো আবার মায়ের প্রিয় পাত্রে পরিণত হতে পারবে।

সেকেন্ডারি স্কুলে চার বছর পড়াশোনা শেষে রডনি এখন কলেজে ভর্তি হতে প্রস্তুত। সে GCSE নিল এবং বেশিরভাগ C পেল। এতে সে অনেক ছাত্রের চেয়ে ভালো প্রমাণিত হলেও যারা A এবং B পেয়েছে তাদের থেকে প্রতিযোগিতায় স্বভাবতই পিছিয়ে রইলো। দুর্ভাগ্যজনকই বলতে হবে তার গ্রেড এমন আহামরি নয় যে, পছন্দমতো কলেজে সে ভর্তি হতে পারবে।

যে কলেজে রডনি ভর্তি হলো সেখানে নম্বর দেয়ার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। কেমিস্ট্রি ক্লাসে ত্রিশজন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে রডনি শুনলো মাত্র পাঁচজন পেয়েছে A গ্রেড, এবং পাঁচজন B গ্রেড। বাকিরা সব C এবং D। C এবং D এড়াতে রডনি কঠোর পরিশ্রম শুরু করলো এবং ভাগ্যক্রমে ই পেল।

এভাবে এগিয়ে চললো...

এরকম পৃথিবীতে বেড়ে উঠলে এতে অবাক হওয়ার কী আছে, রডনি এবং আমরা বেড়ে উঠবো জীবনটাকে প্রতিযোগিতার একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখে এবং চিন্তা থাকবে সব কিছুতে জিততে হবে। এতে কি অবাক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে

যে, আমরা কেবল খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠতে চাইবো? তবে সৌভাগ্যবশত তুমি আমি ভিক্টিম নই। আমাদের প্রো-এ্যাকটিভ হওয়ার শক্তি রয়েছে এবং আমরা এই হার-জিত অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো।

হার-জিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসীরা নানান মুখোশ পরে থাকে। যেমন:

* তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে লোকদের মানসিক বা শারীরিকভাবে ব্যবহার করে।
* অন্যদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার প্রবণতা থাকে তাদের।
* অন্যদের ব্যাপারে গুজব ছড়িয়ে বেড়ায়।
* অন্যদের আবেগ-অনুভূতিকে পাত্তা না দিয়ে সবসময় নিজের স্বার্থটাকেই প্রাধান্য দেয়।
* ঘনিষ্ঠ কারও উন্নতি দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়।

শেষ পর্যন্ত এই হার-জিত দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের ক্ষেত্রে ব্যাকফায়ার হয়। তুমি হয়তো টোটেম পোলের মাথায় উঠতে পারবে কিন্তু ওখানে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে, তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব থাকবে না।

'ইঁদুর দৌড়ের সমস্যা হলো', বললেন অভিনেত্রী লিলি টমলিন, 'তুমি এ দৌড়ে জিততে পারলেও শেষ পর্যন্ত তুমি ইঁদুরই থাকবে।'

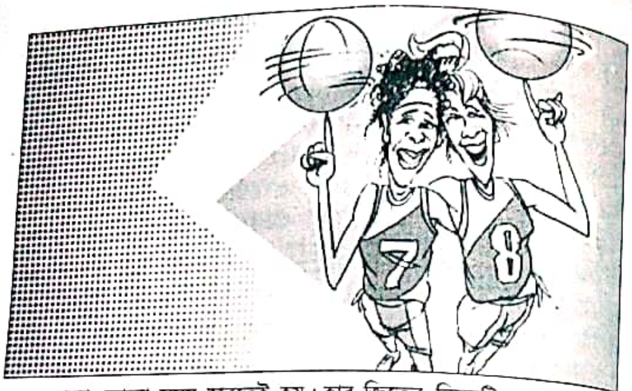
হার-জিত পাপোশ

এক কিশোর লিখেছে :

'আমি একজন বড় পিসমেকার। ঝগড়া ঝাঁটির পরিবর্তে আমি যে কোনো দোষ নিজের ঘাড়ে নিতে চাই। আমি দেখছি প্রায়ই নিজেকে সম্বোধন করছি নির্বোধ বলে...'

এ কথার সঙ্গে কি নিজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তাহলে বলবো তুমি হার-জিতের ফাঁদে পড়ে গিয়েছ। এটিকে পাপোশ সিনড্রোম বলা চলে। হার-জিত বলে, 'তুমি আমার সঙ্গে থাকো। তোমার মুখখানা মোছো আমার গায়ে। সবাই তাই করে।'

হার-জিতের বিষয়টি দুর্বল। এতে পা দেয়া সহজ। পিস মেকারের নামে নিজের সবকিছু ছেড়ে দেয়াই যায়। তাতে কিন্তু তোমাকে অনেক কিছুর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে হবে। তুমি জীবনের প্রতি হার-জিতকে মূল দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ধরে নিলে লোকে তাদের নোংরা পা মুছে নেবে তোমার গায়ের ওপর। সেটি বড় লজ্জাকর হবে। তোমাকে নিজের প্রকৃত অনুভূতিগুলো অনেক গভীরে লুকাতে হবে। এটি সুখের খবর নয়।



কোনো কোনো সময় হারতেই হয়। হার-জিতের বিষয়টি ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক আছে, যদি তুমি এটিকে বেশি পাত্তা না দাও। যেমন তুমি এবং তোমার বোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছো না ওয়াড্রোবের কোন দিকটা বাছাই করবে অথবা তুমি যেভাবে পোশাক পরো তা তোমার মায়ের পছন্দ নয়। এসব ছোটখাটো বিষয়ে অন্যদেরকে জিততে দাও। এসব তাদের RBA-তে ডিপোজিট হয়ে থাকবে। তুমি শুধু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোকেই গুরুত্ব দেবে।

তুমি যদি অপমানজনক কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে হার-জিতের গভীরে চলে যাবে। অপমান এমন একটি বৃত্ত যার শেষ নেই। সেখানে শুধু আঘাতই আছে। তুমি যতই চেষ্টা করো এ সার্কেলে একবার ঢুকে গেলে আর জিততে পারবে না। কাজেই এখান থেকে বেরিয়ে এসো। কেউ অপমানিত হলে সেটি তোমার দোষ ভেবো না। কিংবা কারও দ্বারা অপমানিত হওয়ারও তোমার প্রয়োজন নেই। একটি পাপোশ তেমনই চিন্তা করে। কেউ অপমান হওয়ার জন্য এ জগতে জন্মায়নি।

যখন সবার ক্ষতি

সবার ক্ষতি বলে, 'আমার যদি পতন হয় তোমাকে নিয়েই হবে।' দুঃখ-দুর্দশা সবসময়ই সঙ্গী পছন্দ করে। যুদ্ধ সবার ক্ষতির মস্ত উদাহরণ। যুদ্ধে সবচেয়ে যারা বেশি মানুষ হত্যা করতে পারে তারাই জিতে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত কেউই কিন্তু জেতে না। প্রতিশোধ গ্রহণও এই সবার ক্ষতির ক্যাটাগরিতে পড়ে। প্রতিশোধ নিয়ে তুমি হয়তো ভাবছো জিতে গেছো, আসলে এতে তুমি নিজেকেই আঘাত করছো।

সবার ক্ষতির ব্যাপারটা ঘটে যখন দুটি হার-জিত পার্টি একত্রিত হয়। যদি তুমি যে কোনো মূল্যে জয়ী হতে চাও এবং অপর পক্ষটিও যেভবেই হোক জিততে চায়, শেষে দু'জনেরই কপালে কিন্তু হার লেখা আছে।

সবার ক্ষতির বিষয়টি কেউ যখন অপরজনকে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে দেখতে থাকে, তখনও ঘটে। আর এটি সবচেয়ে বেশি ঘটে আমাদের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে।

'আমার ভাই যদি বিফল হয় তাহলে আমার কী হলো তা গ্রাহ্য করি না।'

যদি সতর্ক না থাকো, বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্কও কিন্তু সবার ক্ষতিতে রূপ নিতে পারে। দু'জন মানুষ ডেটিং শুরু করে এবং শুরুতে সবকিছু বেশ সুন্দরভাবে এগোয়। এটি তখন থাকে Win-Win অবস্থায়। কিন্তু ক্রমে তারা ইমোশনালি একে অপরের সঙ্গে আঠার মতো লেগে যায়, এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তারা হয়ে ওঠে কর্তৃত্বপরায়ণ এবং ঈর্ষাকাতর। একজন আরেকজনের ওপর সর্দারী ফলাতে যায়, তাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে চায়। অবশেষে এটা দারুণ তিক্ততায় পরিণত হয়। তারা তর্ক শুরু করে, ঝগড়া-ঝাঁটিতে মেতে ওঠে এবং শেষতক দু'জনেরই ক্ষতি হয়, ভেঙে যায় সম্পর্ক।

Win-Win বা দু'জনেই জেতো যত ইচ্ছে খেতে পারো বুফে

Win-Win এমন একটি বিশ্বাস যেখানে ধারণা করা হয় সবাই জিতবে। এটি একই সঙ্গে ভালো এবং মন্দ। আমি তোমার ব্যাপারে নাক গলাবো না, তবে তোমার পাপোশ হয়েও থাকবো না। তুমি অন্য লোকদের পছন্দ করো এবং চাও তারা জীবনে সাফল্য লাভ করুক। Win-Win পর্যাপ্ত। ধারণা করা হয় সাফল্যের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এটি তুমি আমি নয়, দু'জনেই। কে পাইয়ের সবচেয়ে বড় টুকরোটি পাচ্ছে বিষয়টি তা নয়। এটি যত ইচ্ছে খেতে পারো বুফের মতো।

তুমি Win-Win চিন্তা করতে পারো। নিচে এ সম্পর্কিত কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

* তুমি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করো সেখানে সম্প্রতি তোমার প্রমোশন হয়েছে। এ প্রমোশন পেতে তোমাকে যারা সাহায্য করেছে তাদের সকলকে নিয়ে এ প্রশংসা এবং স্বীকৃতি ভাগ করে নিতে পারো।

* তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডটি সদ্য সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে যেখানে তোমারও পড়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তুমি পারোনি। নিজের জন্য মন খারাপ

হলেও বন্ধুর জন্য খুশি হও।

* তুমি বাইরে ডিনার খেতে যেতে চাও। তোমার বন্ধু মুভি দেখতে চাইছে। এক্ষেত্রে মুভির সিডি ভাড়া করে বাড়িতে খাবার এনে দু'জনে মিলে খেতে খেতে ছবিটি দেখতে পারো।

টিউমার টুইনদের এড়িয়ে চলো

দুটো বিশ্রী অভ্যাস রয়েছে টিউমারের মতো, যা তোমাকে ভেতরে ভেতরে খেয়ে ফেলতে পারে। এরা টুইন বা যমজ। এদের একটির নাম প্রতিযোগিতা, অপরটি তুলনা। এরা সঙ্গে থাকলে Win-Win ভাবা অসম্ভব।

প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর হতে পারে। এটি আমাদের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম। প্রতিযোগিতা ছাড়া আমরা কখনো বুঝতে পারবো না আসলে কতদূর যেতে পারবো। ব্যবসায়ের জগতে প্রতিযোগিতা অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। অলিম্পিক খেলা কিন্তু চমৎকারিত্ব আর প্রতিযোগিতারই বিষয়।

তবে প্রতিযোগিতার আরেকটি দিক রয়েছে যা ঠিক শোভন নয়। 'স্টার ওয়ার্স' সিনেমায় লিউক স্কাইওয়াকার একটি পজিটিভ এনার্জি শিল্ডের কথা জানতে পারে, যার নাম 'দ্য ফোর্স।' এটি সবকিছুতে প্রাণ সঞ্চার করে। পরে লিউক যখন শয়তান ডার্থ ভেডারের সঙ্গে লড়াই করে, তখন ফোর্সের 'অন্ধকার দিক'টির কথা জানতে পারে। ডার্থ বলে, 'তুমি শক্তির অন্ধকার দিকের কথা জানো না।'

প্রতিযোগিতারও একটি অন্ধকার দিক রয়েছে। একটি আলোকিত দিক, অপরটি অন্ধকার দিক। দুটিই শক্তিশালী। তবে পার্থক্য হলো : প্রতিযোগিতাটি স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে যখন তুমি নিজের সঙ্গে তা করো, কিংবা শীর্ষে পৌছানোর জন্য এটি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তুমি তখন সেরাটি দেয়ার চেষ্টা করো। আর প্রতিযোগিতা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, যখন তুমি জিতবার জন্য নিজেকে এটার সঙ্গে বেঁধে ফেলো অথবা অন্য কিছুর ওপর অবস্থান নিতে এটি ব্যবহার করো।

একজন বিখ্যাত কোচ একবার বলেছিলেন, একজন অ্যাথলেটকে দুটি অত্যন্ত বাজে বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়—ব্যর্থতার ভয় এবং জিতবার অপরিমিত ইচ্ছা অথবা যে কোনো মূল্যে জয়লাভ করার অ্যাটিটিউড।

বীচ ভলিবলে আমার ছোট ভাইয়ের দল আমাদেরকে হারিয়ে দেয়ার পর ওর

সঙ্গে আমার যে ঝগড়া লেগে গিয়েছিলো তার কথা কোনোদিন ভুলবো না।

'তোমরা আমাদেরকে হারিয়ে দিয়েছো বিশ্বাসই করতে পারছি না,' বললাম আমি।

'এতে অবিশ্বাসের কী আছে?' প্রত্যুত্তরে বললো সে। 'তোমার কি ধারণা তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো খেলো?'

'অবশ্যই। প্রমাণ দেবো। স্পোর্টসে তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি এগিয়ে আছি।'

'কিন্তু তুমি অ্যাথলেটের সংজ্ঞাকে অত্যন্ত সরু চোখে দেখছো। আমি তোমার চেয়ে ভালো খেলোয়াড় কারণ, আমি অনেক বেশি উঁচুতে লাফাতে পারি এবং অনেক জোরে দৌড়াতে পারি।'

'কী যে পারো জানি তো! আমার চেয়ে জোরে ছুটবার শক্তি তোমার নেই। আর লাফালাফি-দৌড়াদৌড়ি করলেই বুঝি সব পেরে গেলে? তোমাকে অন্য যে কোনো খেলায় আমি ঘোল খাওয়াতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

আমরা শান্ত হওয়ার পরে বসে ভাবছিলাম, কী বোকার মতোই না কাজটা করলাম। আমাদেরকে আসলে অন্ধকার দিকটা প্ররোচিত করছিল। আর অন্ধকার দিকের রেশ কিন্তু কখনো কাটে না।

আমরা কে কী পারি তা নিরূপণে প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে কিন্তু বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, সামাজিক মর্যাদা, বন্ধুত্ব, জনপ্রিয়তা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কখনো প্রতিযোগিতা করতে যেয়ো না। বরং জীবনটাকে উপভোগ করো।

তুলনা

তুলনা হলো প্রতিযোগিতার যমজ ভাই। এবং এটি ক্যান্সার রোগের সমগোত্রীয়। অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা স্রেফ আহাম্মকী। কেন? কারণ আমরা সামাজিক, মানসিক, শারীরিক সব দিক থেকেই একজন অপরজন থেকে আলাদা। আমাদের কেউ কেউ পপলার গাছের মতো, এটিকে মাটিতে পুঁতবার পরপরই আগাছার মতো বাড়তে থাকে, আবার কেউ কেউ বাঁশ গাছের মতো, বছর চারেক একেবারেই বৃদ্ধি ঘটে না, তারপর পঞ্চম বছরে নব্বই ফুট উচ্চতায় চলে যায়।

একদা আমি শুনেছিলাম, জীবন হলো প্রতিবন্ধকতার কোর্সের মতো। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব কোর্স রয়েছে, লম্বা দেয়াল দ্বারা সেটি অন্যদের কোর্স থেকে আলাদা করে। তোমার কোর্সে তোমার ব্যক্তিগত বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে নানান প্রতিবন্ধকতা থাকবে। কাজেই উঁচু দেয়ালটি বেয়ে উঠে পড়শী কী করছে এবং তার প্রতিবন্ধকতা কী কী, এসব দেখে নিজের সঙ্গে তুলনা করাটা বোকামো নয় তো কি?

অন্যের সঙ্গে তুলনা করে নিজের জীবন গড়ে তোলা মোটেই ভালো কাজ নয়। আমি যদি এরকম নিরাপত্তার আশ্বাস পাই যে, আমার পরীক্ষার ফলাফল তোমার চেয়ে ভালো কিংবা আমার বন্ধুবান্ধব তোমার বন্ধুদের চেয়ে অধিকতর জনপ্রিয়, তখন কী ঘটবে যদি এমন একজনের আবির্ভাব ঘটে, যার পরীক্ষার রেজাল্ট আমার চেয়ে অনেক ভালো এবং তার বন্ধুরা আমার বন্ধুদের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়?

একজনের সঙ্গে আরেকজনের তুলনা করাটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। বাতাস এসে ঢেউগুলোকে ওলট-পালট করে দিচ্ছে। আমরা একবার ওপরে উঠছি আবার নিচে নামছি। এক মুহূর্ত হীনমন্যতায় ভুগছি, আবার পরের মুহূর্তে নিজেকে কেউকেটা ভাবছি। এক মুহূর্ত আত্মবিশ্বাস থাকছে, পরের মুহূর্তে ভয় গ্রাস করছে। একমাত্র ভালো তুলনা হলো, নিজের সম্ভাবনা বিচার করে তার সঙ্গে নিজের তুলনা করা।



অ্যানি নামের একটি মেয়ের ইন্টারভিউ করেছিলাম। সে তুলনার জালে সাংঘাতিকভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। পরে বহু কষ্টে সেখান থেকে তার রেহাই মেলে। সে যে মেসেজটি দিয়েছে তা সকলের জন্য প্রযোজ্য :

GCSE শুরুর আগে নতুন স্কুলে ভর্তির পরে আমার সমস্যাগুলোর শুরু। নতুন স্কুলের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ছিল বড়লোকের সন্তান। কীভাবে তুমি পোশাক পরে স্কুলে আসছো সেটি সবাই খেয়াল করতো। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল: আজ কে কী পরছে? অলিখিত আইন ছিল একই পোশাক দু'বার পরে আসা যাবে না এবং কেউ যদি ওই ড্রেসটি পরে, তাহলে আরেকজন ওটা পরতে পারবে না। ব্রান্ড নেম এবং দামী দামী জিনস্ তো পরতেই হবে। প্রতিটি রঙ এবং স্টাইল তোমাকে শো করতে হবে।

প্রথম বছরে আমার একটি বয়ফ্রেন্ড হয়েছিল। সে আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। তাকে আমার বাবা-মা তেমন পছন্দ করতেন না। তবে শুরুতে আমার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ভালোই যাচ্ছিলো, কিছুদিন পরে সে আমার ভেতরে আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তোলার নামে অন্যদের সঙ্গে তুলনা শুরু করে নেয়। সে বলতো, 'তুমি কেন ওর মতো নও?' 'তুমি এতো মোটা কেন?' 'তোমার চেহারায় যদি একটু পরিবর্তন হতো, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যেত।'

বয়ফ্রেন্ডের কথা আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি। আমি অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে নিজের তুলনা করতে থাকি। বিশ্লেষণ করি, কেন আমি ওদের মতো হতে পরিনি। আমার ওয়াড্রোব ভর্তি জামাকাপড় থাকলেও আমাকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সবসময় হামলা করতো, কারণ সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না কী পরবো। আমি এমনকী শপ লিফটিংও শুরু করে দিই সেরা জামা-কাপড়ের জন্য। আমি সারাক্ষণ শুধু অন্যদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতাম আর হতাশ হতাম।

এর ফলে কী হলো, একসময় আমি খাওয়া-দাওয়ায় আসক্ত হয়ে পড়লাম। আমি মোটা না হলেও মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাই আমি যা খেতাম সব বমি করে ফেলে দিতাম। একথা আমার বাবা-মাও জানতেন না।

একবার আমি আমার স্কুলের একটি জনপ্রিয় গ্রুপকে অনুরোধ করেছিলাম, ওদের সঙ্গে যেন আমাকে ফুটবল খেলা দেখতে নিয়ে যায়। ওই দলের সদস্যদের বয়স ছিল ষোলো, আমার চেয়ে এক বছরের বড়। আমি তখন খুব উত্তেজিত ছিলাম। মা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে আমাকে সুন্দর দেখায়। আমি জানালার ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু ওরা আর আসেনি

আমাকে নিয়ে যেতে। নিজেকে এমন হতভাগ্য মনে হয়েছিল! আমি ভাবছিলাম, 'ওরা আমাকে খেলা দেখতে নিয়ে যায়নি, কারণ হয়তো আমি দেখতে তেমন স্মার্ট নই কিংবা চেহারা ভালো না।'

এ চিন্তাটি আমার মাথায় সাংঘাতিকভাবে গেঁথে গিয়েছিল। একবার মঞ্চে নাটকে অভিনয় করছি, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। ড্রেসিং রুমে যাওয়ার পরে দেখি মা ওখানে বসে আছেন। 'আমার সাহায্য দরকার।' ফিসফিস করে বলি আমি।

আমার সেরে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। এখন পেছন ফিরে তাকালে ভাবতে কষ্ট হয়, ওইরকম একটি অবস্থায় পৌছে গিয়েছিলাম। সুখী হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সবই আমার ছিল। তবু আমি দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম। আমি দেখতে কিউট ছিলাম, ট্যালেন্টেড ছিলাম, রোগাটে গড়ন ছিল আমার, অথচ লোকের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে গিয়ে সবকিছু হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম। আমি সবাইকে চিৎকার করে বলতে চাই, 'কখনও নিজের সঙ্গে অমনটি কোরো না। করে কোনো ফায়দা পাবে না।'

আমার সুস্থ হয়ে ওঠার পেছনে আমার কিছু বিশেষ বন্ধুর অবদান ছিল। তারাই আমাকে বোঝাতে সক্ষম হয় আমার কাছে নিজেকেই সবচেয়ে প্রাধান্য পাওয়া উচিত, আমি কী পরিধান করছি তা নয়। তারা আমাকে বলেছে, 'তোমার এসবের দরকার নেই। তুমি ওসবের চেয়ে অনেক ভালো।' এরপর আমি নিজেকে বদলাতে শুরু করি।

এ গল্পের মুখ্য জিনিসটি হলো : তুলনা বন্ধ করো। অভ্যাস ভাঙো। তুলনা করা মাদকাশক্তির মতোই ভয়াবহ নেশায় পরিণত হতে পারে। মডেলের মতো হওয়ার তোমার দরকারটা কী? তুমি জানো তোমার জন্য সবসময় ভালো কী হবে। খেলার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ো না এবং কিশোর বয়সের জনপ্রিয়তা নিয়ে অত দুশ্চিন্তারও প্রয়োজন নেই। কারণ আসল জীবন তারপরই শুরু হবে।

Win-Win স্পিরিটের আসল মাজেজা

Win-Win ব্যাপারটি বড্ড সংক্রামক। তুমি যদি বিশাল হৃদয়ের মানুষ হও, অন্যদের সাহায্য করো, তুমি বন্ধুদের কাছে হয়ে উঠবে চুম্বকের মতো। তারা সবাই তোমার কাছে ছুটে আসবে। তুমি তো সেইসব মানুষকেই ভালোবাসো যারা তোমার সাফল্য নিয়ে ভাবে এবং চায় তুমি জিতবে? বিনিময়ে তুমিও নিশ্চয় এদেরকে সাহায্য করতে চাও?

মাঝে মাঝে এমনটি দেখা যায় তুমি যতই চেষ্টা করো Win-Win সমাধান মিলছে না। অথবা অপর পক্ষ হার-জিতের দিকে এমন ঝুঁকে আছে যে, তুমি তার কাছে ঘেঁষতেই আগ্রহবোধ করছো না। এরকমটি হয়। এক্ষেত্রে হয় তুমি Win-Win অবস্থায় যাবে কিংবা No Deal অবস্থায়। এর অর্থ যদি দেখো কোনো সমাধান পাচ্ছো না, যাতে দুই পক্ষেরই লাভ হতে পারে, তাহলে খেলতে যেয়ো না। নো ডিল।

Win-Win অ্যাটিটিউড ডেভেলপ করা সহজ কাজ নয়। তবে তুমি পারবে। যদি ভাবো এ মুহূর্তে Win-Win অবস্থা মাত্র ১০ শতাংশ, ভাবতে থাকো এটিকে ২০ শতাংশে উন্নীত করবে, তারপর তা শতাংশের দিকে এগিয়ে যাবে। অবশেষে এটি একটি মানসিক অভ্যাসে পরিণত হবে এবং তোমাকে এটি নিয়ে আর ভাবতেই হবে না। এটি তোমার অংশ হয়ে উঠবে।

ছোট ছোট পদক্ষেপ

১) যেখানে তুলনা আসতে পারে জীবনের সেই অংশগুলো চিহ্নিত করো

২) খেলাধুলা করলে স্পোর্টসম্যানশিপ দেখাও। খেলা শেষে প্রতিপক্ষের প্রশংসা করার উদারতা প্রদর্শন করো।

৩) কাউকে টাকা ধার দিলে সেটা ভদ্রভাবে ফেরত চাইবে। 'তোমাকে গত সপ্তাহে যে একশো টাকা ধার দিয়েছিলাম আশা করি ভুলে যাওনি। ওটা এখন আমার একটু দরকার হয়ে পড়েছে।' Win-Win চিন্তা করো, Lose-Win নয়।

৪) হারবে নাকি জিতবে এসব চিন্তা না করে কারও সঙ্গে তাস, দাবা বা কম্পিউটার গেম খেলতে পারো।

৫) তোমার কি গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরীক্ষা আছে সামনে? তাহলে কারও সঙ্গে একত্রে বসে পড়াশোনা করতে পারো। তোমার আইডিয়াগুলো তার সঙ্গে ভাগ করে নিতেও দোষ নেই। এতে দু'জনেরই লাভ হবে।

৬) পরেরবার যখন তোমার ঘনিষ্ঠ কেউ কিছুতে সাফল্য লাভ করবে, মন থেকে খুশি হবে, হুমকি ভাববে না।

৭) জীবন সম্পর্কে তোমার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি কী? এটি কি Win-Lose , Lose-Win Lose-Lose নাকি Win-Win ভাবনার ওপর ভিত্তি করে গঠিত? এই অ্যাটিটিউড তোমাকে কতোটা প্রভাবিত করে?

৮) তুমি এমন কোনো লোকের কথা ভাবো যে Win-Win এর জন্য আদর্শ মডেল। এই মানুষটির কোন্ দিকগুলো তোমাকে আকর্ষণ করে?

ব্যক্তি–
আমি তাদের যে গুণগুলোর প্রতি আকৃষ্ট—
তুমি কি বিপরীত লিঙ্গের কারও সঙ্গে Lose-Win সম্পর্কের মধ্যে রয়েছো? যদি তাই হয়, তাহলে ভেবে দ্যাখো এটিকে তোমার জন্য Win করতে চাইলে অথবা No Deal-এ গিয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে কী ঘটতে পারে।

অভ্যাস ৫

আগে বুঝবার চেষ্টা করো
তারপর উপলব্ধি করো
তোমার আছে দু'টি কান এবং একটি মুখ...



'অপরের জুতো পরে হাঁটার আগে নিজেরটা খুলে নিতে হবে'

—জনৈক লেখক

ধরো তুমি কোনো জুতোর দোকানে ঢুকলে একজোড়া নতুন জুতো কিনতে। বিক্রয় সহকারী জিজ্ঞেস করলো, 'কী ধরনের জুতো চাই তোমার?'

'ইয়ে আমি এমন জুতো খুঁজছি...'

'বুঝতে পেরেছি,' তোমাকে কথা শেষ করতে দিল না বিক্রেতা। 'একজোড়া জুতো নিয়ে আসছি। সবাই এই জুতো জোড়া পছন্দ করেছে।'

সে ছুটে গিয়ে এমন একজড়ো জুতা নিয়ে এলো যা অতিশয় কুৎসিত দর্শন। তুমি জুতো দেখেই বেঁকে বসলে। 'এ জুতো আমার চাই না। আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আরে কী যে বলো তুমি! সবার পছন্দ এ ধরনের জুতো।'

'আমি অন্যরকম কিছু খুঁজছি।'

'আরে এটা নাও! খুব ভালো জুতো।'

'কিন্তু আমি—'

'শোনো, দশ বছর ধরে জুতো বিক্রি করছি আমি। খুব ভালো বুঝতে পারি কাকে কিসে মানায়।'

এরকম অভিজ্ঞতা হওয়ার পরে তুমি কি আর জীবনেও ওই দোকানে পা বাড়াবে? নিশ্চয় না।

যেসব লোক তোমার প্রয়োজন কী, তা না জেনে আগেই সমাধান দিতে চায় তাদের ওপর তোমার আস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যে প্রায়ই এ কাজটি করে থাকি তা কি জানো?

'হেই, মোলিসা, খবর কী তোমার? তোমাকে খুব হতাশ লাগছে। কোনো সমস্যা?'

'তুমি বুঝবে না, কলিন। শুনলে ভাববে বোকার মতো কাজ করেছি।'

'না, তেমন কিছু ভাববো না। কী হয়েছে বলো। আমি শুনবার জন্য তৈরি।'

'নাহ্, তোমাকে বলা যাবে না।'

'আরে, বলোই না।'

'বেশ, ইয়ে মানে... আমার আর টনির মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক আর আগের মতো নেই।'



'তোমাকে বলেছিলাম ওর সঙ্গে জড়িয়ো না। জানতাম এমনটি ঘটবে।'

'টনি মূল সমস্যা নয়।'

'শোনো, মেলিসা, তোমার জায়গায় আমি হলে ওর কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে জীবনটা নিজের মতো চালিয়ে নিতাম।'

'কিন্তু, কলিন, আমি সেরকম কিছু ভাবছি না।'

'তুমি কী ভাবছো আমি বেশ বুঝতে পারছি। গতবছর একই সমস্যায় আমিও পড়েছিলাম। মনে নেই তোমার? আমার গোটা বছরটাই মিসমার হয়ে গিয়েছিল।'

'বাদ দাও, কলিন।'

'মেলিসা, আমি তোমাকে কেবল সাহায্য করতে চাইছি। আমি সত্যি ব্যাপারটা বুঝতে চাই। তোমার কেমন লাগছে বলো।'

আমাদের প্রবণতাই হলো সুপারম্যানের মতো সাঁই করে আকাশ থেকে উদয় হয়ে কোনো সমস্যা বুঝবার আগেই তা সমাধানের চেষ্টা করা। আমরা আসলে সমস্যার কথা ভালোভাবে শুনতেই চাই না। একটি ইন্ডিয়ান প্রবাদ আছে, 'শোনো নতুবা তোমার জিভ তোমাকে বধির বানিয়ে দেবে।'

আগে লোকের কথা শুনবে, তারপর বুঝবার চেষ্টা করবে। কথাটি এভাবেও বলা যায়, আগে শোনো, তারপরে বলো। এ হলো ৫ম অভ্যাস। যদি এ সাধারণ অভ্যাসটি বুঝতে পার—নিজেরটা শেয়ার করার আগে অন্যজনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছু দেখতে পার—তাহলো উপলব্ধির নতুন একটি জগত খুলে যাবে।

মানব হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর প্রয়োজন

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় এ অভ্যাসটির কেন প্রয়োজন? কারণ মানব হৃদয়ের গভীরতম প্রয়োজনকে বুঝবার দরকার রয়েছে। সবাই সম্মান এবং শ্রদ্ধা চায়। মানুষ তার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলোকে তুলে ধরবে না, যদি না তারা প্রকৃত ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারে। প্রকৃত ভালোবাসার পরশ পেলে তারা তুমি যা বুঝতে চেয়েছো তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলবে।

নিচের গল্পটি একটি মেয়ের, যে ক্ষুদামন্দা রোগে ভুগতো অর্থাৎ কোনো কিছু খেতে ভালো লাগতো না তার। তারপর কী ঘটলো দেখো :

ফার্স্ট ইয়ারে, আমার ইউনিভার্সিটি রুমমেট জুলি, প্যাম এবং লিজের সঙ্গে যখন পরিচয় হয় ওইসময় আমি রীতিমতো ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছি। স্কুলের শেষ দুই বছর আমি এক্সারসাইজ করেছি, ডায়েট করেছি শুধু ফিগার ঠিক রাখার জন্য। কিন্তু ১৮ বছর বয়সে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতার আমি হয়ে উঠি ৪৩ কেজি ওজনের হাড় জিরজিরে এক তরুণী।

আমার বন্ধু সংখ্যা ছিল খুব কম। ক্রমাগত স্বাস্থ্যহানি আমাকে অত্যন্ত খিটখিটে করে তোলে। আমি খুব ক্লান্ত বোধ করতাম। মানুষজনের সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগতো না। স্কুলের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোয় অংশ নেয়া দূরে থাক, আমার পরিচিত কোনো মেয়ের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারতাম না। আমার কিছু ভালো বন্ধু আমাকে সাহায্য করার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমার ওজন নিয়ে তাদের বক্তৃতা শুনলে বরং আমি বেজায় বিরক্ত হতাম।

আমার বাবা-মা আমাকে ঘুষ হিসেবে নতুন নতুন জামা-কাপড় কিনে দিতেন। তাঁরা বলতেন, আমি যেন তাঁদের সামনে বসে খাওয়া দাওয়া করি। কিন্তু করতাম না বলে তাঁরা আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যান, থেরাপিস্ট এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। নিজেকে আমার খুবই ভাগ্যহীনা মনে হতো এবং মনে হতো বুঝি এভাবেই কাটাতে হবে গোটা জীবন।

তারপর আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। আমার ভাগ্য আমাকে জুলি, প্যাম এবং লিজের সঙ্গে একত্রে থাকতে নির্ধারিত করে দেয়। ওরা আমার জীবনটাকে বদলে দিয়েছিল আমূল।

আমরা তিনজনে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম, যেখানে সবার সামনেই চলতো আমার বিভিন্ন আহারপর্ব। আমার হাড্ডিসার শরীর নিশ্চয় ওদের কাছে অদ্ভুত লাগতো। আমার আঠেরোর ছবি দেখে নিজেই শিউরে উঠতাম আতংকে। কী বিশ্রী দেখাচ্ছে আমায়!

কিন্তু ওরা আমাকে অবহেলার চোখে দেখেনি। আমাকে কোনো উপদেশ দেয়নি, জোর করে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করেনি। আমাদের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে গসিপ চলতো না।

'আমি হঠাৎ করেই নিজেকে ওদের একজন বলে ভাবতে শুরু করি। শুধু পার্থক্য একটাই—আমি খেতাম না। আমরা একসঙ্গে ক্লাসে যেতাম, চাকুরি খুঁজতাম, সন্ধ্যাবেলায় জগিং করতাম, টিভি দেখতাম, শনিবার একসঙ্গে ঘুরতে বেরুতাম। আমার ক্ষুধামান্দ্য রোগটি কখনোই মূল আলোচ্য বিষয় হতো না। বদলে আমরা রাত জেগে গল্প করতাম আমাদের পরিবার, আমাদের লক্ষ্য, আমাদের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি নিয়ে।

আমাদের মধ্যে মিলগুলো আমাকে বিস্মিত করতো। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি যেন নিজেকে উপলব্ধি করতে শুরু করি। অনুভব করি কেউ এই প্রথম আমাকে বুঝতে লেগেছে, আমার সমস্যা নিয়ে সর্বদা নাক গলাচ্ছে না। এই তিনটি মেয়ের কাছে আমার ক্ষুধামান্দা রোগটি কখনোই প্রাধান্য পায়নি। তারা সবসময় আমাকে তাদের মতো করে আমাকে ভেবেছে।

আমি ওদেরকে এরপরে লক্ষ্য করতে শুরু করি। ওরা সুখি, আকর্ষণীয় ও স্মার্ট। ওদেরকে দেখি মাঝেমধ্যে কেক খাচ্ছে। তো আমি যদি ওদের মতো নিজেকেও ভাবি, তাহলে ওদের মতো কেন দিনে তিনবার খাবার খাই না?

প্যাম, জুলি এবং লিজ কোনোদিন আমাকে বলেনি, কীভাবে এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবো। আমাকে আসলে ওরা একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে ক্ষুধামন্দা থেকে উদ্ধার মিলবে। ইউনিভার্সিটির প্রথম টার্ম শেষ হওয়ার আগেই আমি ওদের সঙ্গে একত্রে বসে ডিনার খেতে শুরু করি।

চতুর্থ মেয়েটির ওপর বাকি তিনটি মেয়ের প্রভাবের কথা একবার চিন্তা করে দেখো। তারা কিন্তু মেয়েটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে যায়নি, শুধু ওকে বুঝতে চেয়েছে। ফলে চতুর্থ মেয়েটি তার নাছোড়বান্দা ভাবটি ত্যাগ করে ওদের সঙ্গে মিশে গেছে।

এ কথাটি কি কখনো শুনেছো যে, 'তুমি লোককে কতোটা কেয়ার করো না জানা পর্যন্ত তুমি কী জানো তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না?' কথাটি খুব সত্যি। কেউ যদি তোমার কথা শুনতে বা বুঝতে না চায়, তুমি কি তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবে? মনে হয় না।

শ্রবণের পাঁচটি দুর্বল স্টাইল

কাউকে বুঝতে হলে তার কথা তোমার শোনা দরকার। সমস্যা হলো আমাদের বেশিরভাগেরই জানা নেই কীভাবে শুনবো।

লোকে যখন কথা বলে তাদের কথা আমরা খুব কমই শুনি, কারণ নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকি অথবা তাদের কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমরা কথা শুনবার জন্য নিচের পাঁচটি স্টাইলের যে কোনো একটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য খুবই টিপিক্যাল হয়ে যাবে।

কথা শুনবার পাঁচটি দুর্বল স্টাইল

অন্যমনস্ক থাকা

অন্যমনস্ক থাকা মানে যখন কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনছি না, আমাদের মন তখন অন্য ভুবনে বিচরণে ব্যস্ত। তারা হয়তো খুব জরুরি কথাই বলছে কিন্তু আমরা ডুবে আছি নিজেদের ভাবনায়।

কথা শুনবার ভান করা

কথা শুনবার ভান করা খুবই সাধারণ একটি বিষয়। যে কথা বলছে তার কথায় আমরা তেমন মনোযোগ না দিলেও ভান করি যে, কথা শুনছি। তাই তার কথার মধ্যে 'হ্যাঁ', 'হুঁ' করে সায় দিই। এ ব্যাপারটি বক্তা ঠিকই বুঝতে পারে এবং ভাবে তাকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না।

নির্বাচিত কিছু কথা শ্রবণ

নির্বাচিত কিছু কথা শ্রবণের অর্থ, বক্তার কিছু কথা আমরা শুনে থাকি যে অংশটুকু আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হয়। যেমন ধরো, তোমার বন্ধু তোমাকে বলছে, তার প্রতিভাবান ভাইটি সেনাবাহিনীতে যোগদানের চিন্তাভাবনা করছে। সমস্ত কথার মধ্যে হয়তো শুধু 'সেনাবাহিনী' শব্দটি তোমার শ্রুতিগোচর হলো এবং তুমি বলে উঠলে 'ও হ্যাঁ, সেনাবাহিনী। আমিও আজকাল এটি নিয়ে খুব ভাবছি।'

অপরজন কী কথা বলছে বা বলতে চাইছে তা না শুনে যদি তুমি একাই বকবক করে যাও, তাহলে বক্তার সঙ্গে তোমার কোনোদিনই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে না।



শব্দ শ্রবণ

এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু শব্দগুলোই শুনি, বক্তার শরীরের ভাষা লক্ষ্য করি না, তার আবেগ-অনুভূতি নিয়ে মাথা ঘামাই না। কথাগুলোর মূলার্থ বিশ্লেষণেও যাই না। ফলে বক্তা কী বলছে তা আমরা মিস করে যাই। তোমার বান্ধবী কিম হয়তো তোমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'রিচার্ডকে তোমার কেমন মনে হয়?' জবাবে তুমি বলবে—'আমার মনে হয় ও খুব কুল।' কিন্তু তুমি যদি আরেকটু সংবেদনশীল হতে, বান্ধবীর শরীরী ভাষা খেয়াল করতে, তাহলে বুঝতে কিম আসলে বলতে চাইছিল, 'তোমার কি মনে হয় রিচার্ড আমাকে পছন্দ করে?' তুমি যদি শুধু শব্দের ওপর মনোযোগ দাও, তাহলে লোকের গভীরতর আবেগগুলো স্পর্শ করতে পারবে না।

আত্মকেন্দ্রিক শ্রবণ

আত্মকেন্দ্রিক শ্রবণের বিষয়টি ঘটে যখন সবকিছু আমরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি। এক্ষেত্রে বাক্যগুলো সাধারণত এরকম হয়ে থাকে, 'ওহ, আসলে বুঝতে পারছি তুমি কেমন কোর্স করছো।' আসলে কিন্তু আমরা জানি না সে কেমন কোর্স করছে। আমরা শুধু জানি আমরা কেমন কোর্স করছি। আমরা ভাবি আমরা যেরকম কোর্স করছি তারাও সেরকমই বোধ করছে। অনেকটা সেই জুতা বিক্রেতাটির মতো, যার ধারণা তার পছন্দের জুতাই সবাই কিনবে। আত্মকেন্দ্রিক শ্রবণকে ওয়ান-আপম্যানশিপের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে আমরা একে অপরকে টেক্কা দেয়ার চেষ্টা করি, যেন আলোচনাটা একটা প্রতিযোগিতা।

'তোমার ধারণা তোমার দিনটি খারাপ গেছে? আরে ওটা কিছুই না। আমার কী হয়েছিল শোনো।'

আমরা যখন নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু শুনি, অথচ তিনভাবে সাধারণত এর জবাব দিই। আমরা *বিচার করি*, আমরা *উপদেশ দিই* এবং আমরা *নাক গলাই*।

বিচার করার ব্যাপারটি হলো, আমরা যখন অপর পক্ষের কথা শুনি তখন তাদের সম্পর্কে জাজমেন্ট করি বা একটা রায় দিয়ে ফেলি। তুমি যদি কারও ব্যাপারে রায় দিয়ে ফেলো, তার মানে তুমি আসলে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছো না। লোকে রায় জানতে চায় না, তার চেয়ে তোমরা তাদের কথা শুনবে।

নিচের বাতচিত শুনলেই এ বিষয়ে পরিষ্কার একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

পিটার : গত রাতে ক্যাথেরিনের সঙ্গে চমৎকার একটি সময় কাটিয়েছি।

কার্ল : বাহ্, চমৎকার (ক্যাথেরিন? ক্যাথেরিনের সঙ্গে তোমার বাইরে যাওয়ার দরকারটা কী ছিল?)

পিটার : জানতাম না মেয়েটি এতো চমৎকার।

কার্ল : আচ্ছা? (আবার! তোমার চোখে তো সব মেয়েই চমৎকার)

পিটার : হ্যাঁ। ভাবছি ওকে ডান্স করতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেবো।

কার্ল : আমি তো ভেবেছি তুমি জেসিকাকে এ প্রস্তাবটি দেবে। (তোমার মাথা খারাপ! ক্যাথেরিনের চেয়ে জেসিকা দেখতে অনেক সুন্দরী।)

পিটার ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন ভাবছি ক্যাথেরিনকেই বলবো।

কার্ল : বেশ তো বলো। (আমি শিওর বলেই তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টে যাবে?)

কার্ল রায় দেয়ার ব্যাপারে এমন ব্যস্ত ছিল যে, পিটার কী বলছে ভালোভাবে খেয়ালই করেনি। ফলে পিটারের RBA তে সে ডিপোজিট করার সুযোগ হারিয়েছে।

উপদেশ

আমাদের সমস্যা হলো, কথা শোনার চেয়ে আমরা উপদেশ দিতে বেশি পছন্দ করি। আর বড়রা এ কাজটি বেশি করে।

ছোট বোন তার বড় ভাইকে বলছে :

আমাদের নতুন স্কুলটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। ওখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই নিজেকে একঘরে লাগছে। নতুন কোনো বন্ধুও পাইনি।'

বোনের কথা ভালোভাবে না শুনে বা না জেনেই বড় ভাই বলছে :

'তোমার উচিত নতুন নতুন লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং খেলাধুলা এবং ক্লাবে সম্পৃক্ত হওয়া। আমিও তাই করেছি।

ছোট বোন কিন্তু তার ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম কোনো উপদেশ চায়নি। শুধু চেয়েছে তার ভাই যেন তার কথাগুলো শোনে। সে যদি উপলব্ধি করতো তার ভাই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে, তাহলে তার উপদেশ মেনে নিতো। বড় ভাইটা এভাবে বড় ডিপোজিটের সুযোগ হারালো।

নাক গলানো

লোকে তাদের আবেগ অনুভূতিগুলো শেয়ার করার আগেই যখন সেগুলো খুঁড়ে আনা হয় সেটা নাক গলানোর পর্যায়ে পড়ে। তোমার মা তোমাকে খুব ভালোবাসেন, তোমার ভালো চান এবং সেই অভিপ্রায় থেকে তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানতে চান। কিন্তু তুমি যখন সবকিছু তাঁর সঙ্গে শেয়ার করতে প্রস্তুত থাকো না, তখন তাঁর এ প্রচেষ্টা তোমার কাছে মনে হয় স্রেফ অনধিকার চর্চা। তখন তুমি রেগে যাও এবং তাঁর সঙ্গে আর কথা বলতে চাও না।

'হাই, হানি। আজ স্কুল কেমন হলো?'

'ভালো।'

'পরীক্ষা কেমন হলো?'

'খারাপ না।'

'তোমার বন্ধুদের কী খবর?'

'ওরা ভালোই আছে।'

'আজ রাতে তোমার কোনো প্ল্যান-প্রোগ্রাম আছে?'

'তেমন কিছু নেই।'

'ইদানিং কোনো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ডেটে যাচ্ছো না?'

'না, মা। জাস্ট লিভ মি অ্যালোন।'

জেরা করা কারোরই পছন্দ নয়। তুমি যখন প্রচুর প্রশ্ন করছো কিন্তু সেরকম জবাব মিলছে না, তার মানে তুমি নাক গলাচ্ছো বা অনধিকার চর্চা করছো। মাঝে মাঝে লোকে নিজেদেরকে তুলে ধরার জন্য প্রস্তুত থাকে না এবং কথা বলতেও ভালা লাগে না। ভাল শ্রোতা হতে শেখো এবং কান খোলা রাখো। যখন উপযুক্ত সময় আসবে তখন শুনবে।

আসল শ্রবণ

সৌভাগ্যবশত তুমি আমি কেউই এ দুর্বল পাঁচটি শ্রবণ স্টাইলের মধ্যে নেই, ঠিক? হয়তো মাঝে মাঝে এরকম করে থাকতেও পারি। তবে শ্রবণের উচ্চতর আকার রয়েছে, যা প্রকৃত যোগাযোগ রক্ষায় সহায়তা করে। তবে বলা যায় 'আসল বা প্রকৃত শ্রবণ'। এ ধরনের প্রাকটিসই আমরা করতে চাই। তবে প্রকৃত শ্রোতা হতে হলে তোমাকে তিনটি কাজ করতে হবে।

প্রথমত তোমার চোখ, হৃদয় এবং কান দিয়ে শুনতে হবে।

শুধু কান দিয়ে শুনলেই চলবে না, কারণ যোগাযোগের মাত্র ৭ ভাগ শব্দের সাহায্যে ঘটে। বাকি আসে শরীরী ভাষার মাধ্যমে (৫৩ ভাগ) এবং আমরা কিভাবে কথা বলি বা আমাদের গলার স্বরের মাধ্যমে কতোটুকু আবেগ প্রকাশিত হয় (৪০ ভাগ)।

লোকে কী বলছে শুনতে হলে তারা কী বলছে না তা জানতে হবে। মানুষ ওপরে যে ভাবই দেখাক না কেন, বেশিরভাগ চায় লোকে যেন তার কথা শোনে এবং বুঝতে পারে।

অন্যদের মতো করে শুনতে হবে

প্রকৃত শ্রোতা হতে হলে অন্যদের মতো করে শুনতে হবে। রবার্ট বার্ন বলেছেন, 'অন্য লোকের মোকাসিন জুতো পরে মাইলখানেক না হাঁটা পর্যন্ত তুমি গন্ধটা বুঝতে পারবে না।' তারা যেভাবে পৃথিবীটাকে দেখে তোমাকে সেভাবে দেখতে হবে দুনিয়া এবং তাদের মতো করে অনুভব করতে হবে।

ধরো দুনিয়ার সমস্ত লোক রঙিন চশমা পরছে এবং দুটো ছায়া কখনও এক লাগছে না। তুমি আর আমি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখে সবুজ কাচের চশমা তোমারটা লাল। 'দ্যাখো, পানির রং কেমন সবুজ।'

'সবুজ? তোমার মাথা খারাপ নাকি? পানির রং তো লাল।' তুমি জবাব দিলে।

'আরে, তুমি দেখছি বর্ণচোরা। পানির রং একদম সবুজ।'

'লাল, গর্দভ!'

'সবুজ।'

'লাল!'

অনেকেই বাতচিতকে প্রতিযোগিতা মনে করে। এটি হলো আমার দৃষ্টিভঙ্গি বনাম তোমার দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা দু'জনেই সঠিক হতে পারি না। বাস্তবে আমাদের আগমন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাছাড়া কথায় জিতে যাওয়ার বিষয়টি বড্ড



হাস্যকর। এটির সাধারণত অবসান ঘটে Win-Lose অথবা Lose-Lose -এ এবং এটি RBA থেকে উইথড্রয়াল নেয়।

প্রাকটিস করো আয়নায়

চিন্তাগুলো আয়নার মতো। আয়না কী করে? এটি কখনো বিচার করে না। কোনো উপদেশ দেয় না। এটি শুধু প্রতিফলন ঘটায়। আয়নায় প্রাকটিস করার মানে হলো: *অন্য লোকে কী বলছে এবং অনুভব করছে সেটি নিজের কথায় রিপিট করো।* আয়নায় প্রাকটিস মানে কাউকে ভেংচানো বা নকল করা নয়। এটি হলো কাকাতুয়ার মতো, কোনো কথা বার বার বলা বা পুনরাবৃত্তি করা।

টম, আমি এ মুহূর্তে স্কুলে সবচেয়ে বাজে সময় পার করছি।

তুমি এ মুহূর্তে স্কুলে সবচেয়ে বাজে সময় পার করছো।

আমি সবগুলো সাবজেক্টে ফেল করছি।

তুমি সবগুলো সাবজেক্টে ফেল করছো।

আরে, আমি যা বলছি তা বলা বন্ধ করো। কী হয়েছে তোমার? আয়নায় পুনরাবৃত্তি আর মিমিক্রি বা অনুকরণের মধ্যে পার্থক্য হলো :

মিমিকিং	আয়নায় প্রাকটিস
শব্দের পুনরাবৃত্তি	রিপিট করা
একই শব্দের বারবার ব্যবহার	নিজের শব্দ ব্যবহার করা
শীতল এবং উদাসীন	উষ্ণ এবং কেয়ারিং

বাবা-মার সঙ্গে সুসম্পর্ক

একসময় বাবা-মা'র সঙ্গে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। তবে একটা পর্যায়ে মনে হতে থাকে, তাঁদের শরীরের ভেতরে এলিয়েন বাস করছে। আমার মনে হচ্ছিলো তাঁরা আমাকে বুঝতে পারছেন না কিংবা ব্যক্তি হিসেবে আমাকে কোনোরকম সম্মান করছেন না। স্রেফ অন্য পাঁচটা বাচ্চার মতো দেখছে। তবে বাবা-মাকে মাঝেমধ্যে যতই দূরের মানুষ মনে হোক না কেন, তুমি যদি যোগাযোগ বা সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারো, তাহলে জীবন আরও সুন্দর হবে।

বাবা বা মা'র সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে তাঁদের কথা শুনবে, যেভাবে তোমার বন্ধুদের কথা শোনো। আমরা বাবা-মাকে প্রায়ই নালিশ করি, 'তোমরা আমাকে বুঝতে পারো না। কেউ আমাকে বুঝতে চায় না।' কিন্তু কখনও কি ভেবেছো তুমিও হয়তো তাদেরকে বুঝতে চাওনি?

ওনাদের ওপরেও অনেক চাপ থাকে। তুমি যখন তোমার বন্ধুবান্ধব কিংবা আসন্ন ইতিহাস পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো, তখন হয়তো তাঁরা চিন্তিত তাঁদের বসকে নিয়ে। কখনও কখনও এমন হয়, চাল কেনা কিংবা বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল দেয়ার মতো টাকা তাঁদের থাকে না। হয়তো তাঁরা অফিসে অপমানিত হয়ে কখনও কখনও বাথরুমে ঢুকে কেঁদেছেন। তোমার মা হয়তো শহরের বাইরে যাওয়ার সুযোগ খুব কমই পান। তোমার বাবার গাড়িটি মান্ধাতা আমলের বলে পড়শীরা হয়তো এ নিয়ে হাসাহাসি করে। তাঁদের স্বপ্নগুলো পূরণ হয়নি তোমাদেরকে মানুষ করতে গিয়ে। শোনো, বাবা-মারাও মানুষ। তারাও হাসেন, কাঁদেন, দুঃখ পান।

তুমি যদি সময় নাও তোমার বাবা-মাকে বুঝবার জন্য, দুটি দারুণ জিনিস ঘটবে। প্রথমত, তাঁদের কাছ থেকে অনেক বেশি সম্মান পাবে।

আমার বয়স যখন উনিশ, আমি জীবনে প্রথম বাবার বই পড়ি। তিনি ছিলেন একজন সফল লেখক এবং সবাই আমাকে বলতো তাঁর বইগুলো খুব ভালো। কিন্তু উনিশের আগে আমি তাঁর কোনো বই ছুঁয়েও দেখিনি। প্রথমত বইটি পড়ার পরে আমার মনে হয়েছিল, 'ওয়াও! মাই ড্যাড ইজ স্মার্ট!'

দ্বিতীয়ত, তুমি যদি তোমার বাবা-মাকে বুঝতে পারো এবং তাঁদের কথা শোনো, তুমি যেটা চাইছো সেটা পাবে। এটি কোনো ধাপ্পাবাজি কৌশল নয়, এটি একটি নীতি। তাঁরা যদি অনুভব করেন, তুমি তাঁদেরকে বুঝতে পারছো, তারা তোমার কথা আরও বেশি শুনতে চাইবেন। তাঁরা আরও বেশি নমনীয় হবেন,

তোমাকে আরও বিশ্বাস করবেন। একবার একজন মা আমাকে বলেছিলেন, 'আমার টিনেজার মেয়েগুলো যদি বুঝতো, কী প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে কাটাতে হয় এবং ঘরের কাজে আমাকে একটু সাহায্য করতো, ওদের জন্য আমি অনেক কিছু করতাম যা ওদের কল্পনাতেও নেই।'

তো, কীভাবে তোমাদের বাবা-মাকে ভালো করে বুঝতে পারবে? তাঁদেরকে কিছু প্রশ্ন করে। শেষ কবে তুমি তোমার বাবা কিংবা মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলে, 'আজ কেমন কাটলো তোমার দিন?' অথবা 'তোমার চাকরির কী কী পছন্দ আর অপছন্দ শুনি?' অথবা ঘরের কোনো কাজে কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

তুমি তাঁদের RBA তে ছোট ছোট ডিপোজিট বা সঞ্চয় করতে পারো। সেটি করার জন্য নিজেকে প্রশ্ন করতে পারো, 'আমার বাবা-মা একটি ডিপোজিটকে কীভাবে বিবেচনা করবে?' তাঁদের মতো করে ভাবার চেষ্টা করো। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখো, তোমারটা দিয়ে নয়।

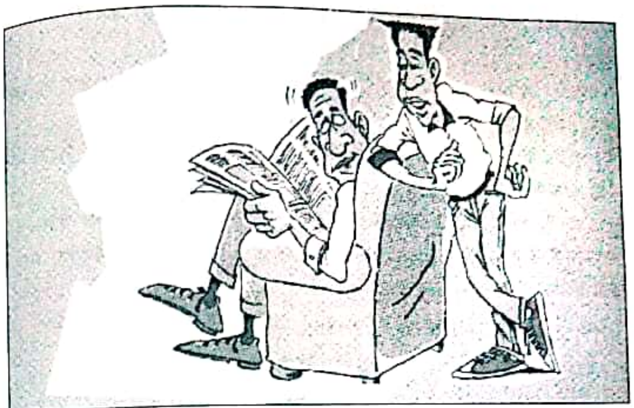
উপলব্ধি করো

একটি সমীক্ষায় কিছু লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের সবচেয়ে বড় ভয় কী। তারা জবাব দিয়েছিল 'মৃত্যু'। তবে এ জবাবটি ছিল দুই নম্বরে। এক নম্বর ভীতি ছিল তাদের 'জনসমক্ষে কথা বলা।' লোকে মৃত্যুর চেয়ে সবার সামনে কথা বলাকে বেশি ভয় পায়, ব্যাপারটি ইন্টারেস্টিং নয় কি?

জনসমক্ষে কথা বলতে সাহস লাগে। তবে সাধারণভাবে কথা বলতেও সাহসের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে বাবা-মা'র সঙ্গে। 'আমার এখন কেমন লাগছে তা বাবা-মাকে বলার সাহস নেই আমার। তিনি আমার কথা শুনবেনও না এবং আমাকে বুঝতেও চাইবেন না। আমরা এরকম ভাবনা মনের মধ্যে পুষে রাখি অথচ বাবা-মা জানতেও পারেন না আমরা কী ভাবছি। কিন্তু এটা ঠিক কাজ নয়। মনে রেখো, অব্যক্ত অনুভূতির মৃত্যু নেই। এগুলোকে জ্যান্ত কবর দেয়া হয় এবং পরে নোংরাভাবে এরা আবার এগিয়ে আসে। তোমার আবেগগুলোকে শেয়ার করতে হবে নইলে এগুলো তোমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে।

তাছাড়াও তুমি যদি শুনবার সময় নাও, তাহলে অন্যরাও তোমার কথা শুনবে। নিচের গল্পটিতে বলা হয়েছে কীভাবে কেলি দুটি অভ্যাসই প্রাকটিস করেছে।

অসুস্থতার কারণে একদিন স্কুলে যেতে পারিনি। বাবা-মা চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন হয় আমার ভালো ঘুম হচ্ছে না কিংবা আমি বাসায় ফিরছি



অনেক দেরিতে। আমি কোনো অজুহাতের কথা না ভেবে তাঁদের কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করলাম। আমি তাঁদের কথায় সম্মতি জানালাম। সেই সঙ্গে এটাও বললাম, আমি স্কুলের শেষ বছরটির অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার চেষ্টা করছি এবং এ জন্য বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে হচ্ছে। বাবা-মা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বুঝতে চাইলেন এবং আমরা একটি সমঝোতায় পৌছলাম। আমি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোর মধ্যে একটি দিন বাড়িতে থেকে বিশ্রাম নিলাম। আমার মনে হয় না আমার বাবা-মাকে যদি আগে বুঝবার চেষ্টা না করতাম, তাহলে তাঁরা আমার সঙ্গে ক্ষমাশীল আচরণ করতেন?

ছোট ছোট পদক্ষেপ

১) কারও সঙ্গে কথা বলার সময় চোখে চোখ রেখে কথা বলবে।

২) কোনো ব্যস্ত রাস্তায় গিয়ে, যাত্রী ছাউনিতে বসে লক্ষ করো লোকে কীভাবে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে?

৩) আয়নায় আজ পুনরাবৃত্তির প্রাকটিস করো এবং অনুকরণের চেষ্টা করো।

৪) নিজেকে শুধাও 'শ্রবণের কোন্ ৫টি দুর্বল স্টাইল আমার জন্য সবচেয়ে সমস্যার?'

যে দুর্বল স্টাইলটিকে নিয়ে আমার সবচেয়ে সমস্যা হয়—

৫) এ সপ্তাহের যে কোনো একসময় বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করো 'কেমন চলছে

তোমাদের দিনকাল?' নিজের হৃদয় খুলে দাও প্রকৃত শ্রোতা হওয়ার প্রাকটিস করো।

৬) তুমি যদি বক্তা হও, একটু বিরতি নাও এবং দিনটি কাটিয়ে দাও লোকের কথা শুনে। শুধু প্রয়োজন হলে কথা বলবে।

৭) পরেরবারে যখন দেখবে নিজের অনুভূতিগুলো কবর দিতে হবে, দিয়ো না। বরং এগুলো প্রকাশ করো।

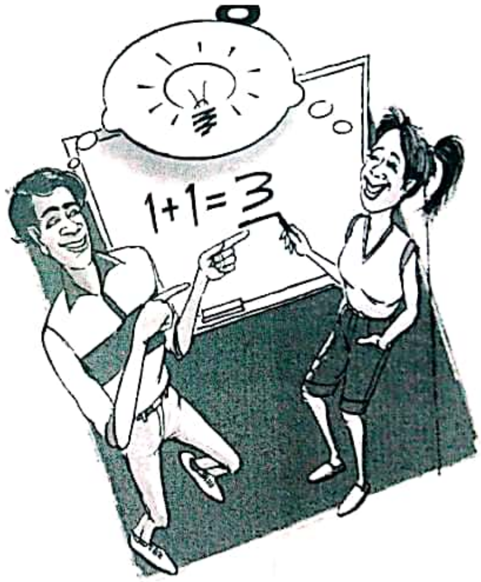
৮) এমন একটি পরিবেশের কথা চিন্তা করো, যেখানে তোমার গঠনমূলক ফিডব্যাক অন্য একজন মানুষকে সত্যি সাহায্য করতে পারবে। যথাযথ সময়ে এটি তাদের সঙ্গে শেয়ার করবে।

ভাবো যে, কোন্ মানুষটি আমার ফিডব্যাক থেকে উপকৃত হতে পারবে—

অভ্যাস ৬

ঐকতান

দ্য 'হাই'ওয়ে



একা আমরা খুব কম কাজ করতে পারি। দুজন হলে অনেক কিছু করা সম্ভব
-হেলেন কেলার

তোমরা কখনও শীতকালে ইংরেজি 'Y' অক্ষরের আকার নিয়ে রাজহংসীদের দক্ষিণ দিকে উড়ে যেতে দেখেছো? এরা কেন এভাবে ওড়ে তা থেকে অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা :

* ওভাবে ঝাঁক বেঁধে উড়লে রাজহংসীরা ৭১ শতাংশ বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে যেটি একা একটি পাখির পক্ষে সম্ভব হয় না।
* যখন নেতৃত্ব দেয়া পাখিটি উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সে ঝাঁকের পেছনে চলে আসে এবং তার জায়গায় আরেকটি পাখি দলটির নেতৃত্ব দেয়।
* পেছনে থাকা রাজহংসীরা সামনের পাখিদের উড়তে উৎসাহ যোগায়।
* কোনো পাখি বিন্যাস থেকে ছিটকে গেলেও একা ওড়ে না, দলের কাছে দ্রুত ফিরে যায়।
* কোনো পাখি অসুস্থ বা আহত হলে ঝাঁক থেকে আলাদা হয়ে পড়লে দুটো রাজহংসী তাদের সঙ্গে থেকে নিরাপত্তা দেয়। আহত পাখিটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা একসঙ্গে থাকে তারা নতুন কোনো বিন্যাসে যোগ দেয় কিংবা নিজেরা আগের দলটির কাছে চলে যায়।

এই রাজহংসীগুলো খুবই স্মার্ট, সন্দেহ নেই! এরা একে অন্যের দুঃখের ভাগীদার হয়, বিন্যাস থেকে বিচ্যুৎ হয় না, আহতদের প্রতি খেয়াল রাখে। এদের দেখে মনে হয় এরা যেন ৬নং অভ্যাস ঐকতানের ক্লাস নিয়েছে। সত্যি...

ঐকতান কী জিনিস? সংক্ষেপে, ঐকতান গঠিত হয় যখন দুই বা ততোধিক মানুষ মিলে তাদের সমস্যার সমাধান করে, একা একা নয়। এটি তোমার রাস্তা নয় আমারও নয়, তারচেয়ে ভালো পথ—উচ্চতর রাস্তা।

ঐকতান হলো	ঐকতান নয়
ভিন্নতাকে উদযাপন	ভিন্নতাকে সহ্য করা
টিমওয়ার্ক	একা একা কাজ করা
খোলা মন	'আমিই ঠিক' এ কথা সবসময় ভাবা
নতুন এবং ভালো পথের সন্ধান	সমঝোতা

ঐকতান রয়েছে সর্বত্র

প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ঐকতান। ৩০০´ ফুট উঁচু প্রকাণ্ড সেকুইয়া গাছের শিকড় একটির সঙ্গে আরেকটি জড়িয়ে থাকে, নইলে ঝড়ে উপড়ে পড়তো গাছ।

অনেক উদ্ভিদ এবং প্রাণিই মিথোজীবী সম্পর্কের ভিত্তিতে একত্রে বসবাস করে। ছবিতে হয়তো দেখে থাকবে গণ্ডারের পিঠে সওয়ার হয়েছে ছোট্ট একটি পাখি। গণ্ডারের গায়ের পোকা খুঁটে খায়। এখানেও ঐকতান রয়েছে। দুজনেই উপকৃত হচ্ছে! খাবার পাচ্ছে পাখিটি আর গণ্ডারের পোকার যন্ত্রণা থেকে রেহাই মিলছে।

ঐকতান নতুন কোনো বিষয় নয়। কোনো দলে থাকলে ঐকতানের সুরটি অনুভব করতে পারবে। কোনো গ্রুপ প্রজেক্টে কাজ করলেও এ অভিজ্ঞতা হয়তো তোমাদের হয়েছে।

একটি ভালো গানের ব্যান্ড দল ঐকতানের চমৎকার উদাহরণ। এটি শুধু ড্রাম, গিটার, স্যাক্সোফোন কিংবা গায়কের বিষয় নয়, সবাই মিলে তৈরি করছে 'শব্দ'। ব্যক্তির প্রতিটি সদস্য যার যার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন কিছু সৃষ্টি করছে, যেটা একা থাকলে হয়তো সম্ভব হতো না।

ভিন্নতাকে সম্মান করা

ঐকতান হঠাৎ করে ঘটে না। এটি একটি প্রক্রিয়া। ওখানে তোমাকে যেতে হবে। আর এখানে যাওয়ার ভিত্তি হলো: ভিন্নতাকে উদ্‌যাপন করতে শেখা।

স্কুলে এক টোঙ্গা ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। নাম তার ফিনি উঙ্গা। দেখলেই ভয় লাগে। ট্যাংকের মতো প্রকাণ্ড শরীর, তার ভয়ংকর চাউনি। সে ছিল গুণ্ডা প্রকৃতির। রাস্তাঘাটে মারামারি করে বেড়াতো, তার সঙ্গে আমার কোনো দিক থেকেই মিল ছিল না। চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, কথা বলার ভঙ্গি সবই ছিল আলাদা। শুধু একটি বিষয়ে মিল ছিল। ফুটবল। তাহলে কী করে আমরা দু'জনে বেস্ট ফ্রেণ্ডে পরিণত হয়েছিলাম? হয়তো আমরা দু'জনে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলাম এ কারণেই। ফিনি কী ভাবতো আমি জানতাম না, কিংবা সে কী করবে সে সম্বর্কেও কোনো ধারণা ছিল না আমার। ওর বন্ধু হওয়ার মজাটা উপভোগ করতাম যখন ও কারও সঙ্গে মারামারি করতো তখন। ওর গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ছিল, যা আমার ছিল না। আবার আমার যে শক্তি ছিল সেটা ওর ছিল না। হয়তো এ কারণেই আমরা দু'জনে একটি দারুণ টিমে পরিণত হই।

আমরা যখন Diversity বা বৈচিত্র শব্দটি শুনি তখন টিপিক্যালভাবে শুধু জাতিগত এবং লিঙ্গভিত্তিক ভিন্নতার কথা ভাবি। কিন্তু বৈচিত্র বা ভিন্নতা শুধু এ দুটিতেই নেই, রয়েছে শারীরিক গঠন, পোশাক-আশাক, আগ্রহ, দক্ষতা, বয়স, স্টাইপসহ আরও অনেক কিছুতেই।

তোমার চারপাশের জগতে এই বৈচিত্র বা ভিন্নতার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কী করে সামলে দেবে সে ব্যাপারে তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিন ধরনের সম্ভাব্য পথ তুমি বেছে নিতে পার :

লেভেল ১ : বৈচিত্র এড়িয়ে চলো
লেভেল ২ : বৈচিত্র মেনে নাও
লেভেল ৩ : বৈচিত্রকে সম্মান করো।

যারা বৈচিত্র এড়িয়ে চলতে চায়

একশ্রেণীর লোক আছে যারা বৈচিত্রে বিশ্বাস করে না, ভয় পায়। একজন মানুষের গায়ের রঙ ভিন্ন, সে ভিন্নধর্মে বিশ্বাসী কিংবা ভিন্ন ধরনের জিনস্ পরে, এরকম কাউকে বৈচিত্র-বিদ্বেষীরা এড়িয়ে চলে। এরা ভিন্ন ধরনের মানুষদের উপহাস করে মজা পায়, নিজেদেরকে ভাবে তারা পৃথিবীকে মহামারীর কবল থেকে রক্ষা করছে। এজন্য তর্ক বা মারামারি করতেও তাদের দ্বিধা নেই।

যারা বৈচিত্র মেনে নেয়

যারা বৈচিত্র মেনে নেয় তারা বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষেরই আলাদাভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে। এরা বৈচিত্রকে এড়িয়ে চলে না, তবে আলিঙ্গনও করে না। তাদের কথা হলো : এটা তুমি নিজের মধ্যে রেখে দাও, আমি এটা আমার মধ্যে রাখবো। তোমার কাজ তুমি করো, আমারটা আমাকে করতে দাও। আমাকে বিরক্ত কোরো না। আমিও তোমাকে বিরক্ত করবো না।'

এরা বেশ কাছে এলেও ঐকতান এদের দ্বারা ঠিক হয়ে ওঠে না, কারণ ভিন্নতাকে এরা সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে না দেখে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখে। তারা জানে না তারা কী মিস করছে।

বৈচিত্রকে যারা সম্মান করে

সেলিব্রেটরা ভিন্নতাকে মূল্য দেয়। এরা একে একটি সুযোগ হিসেবে দেখে, দুর্বলতা নয়। তারা জানে দুটি মানুষ যখন ভিন্ন চিন্তা করে তারা একই রকম চিন্তা করার মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি অর্জন করতে পারে। তারা উপলব্ধি



করে ভিন্নতাকে সম্মান করা মানে লেবার পার্টি কিংবা কনজারবেটিভ পার্টির ভিন্নতাকে মেনে নেয়া নয়। তাদের চোখে ডাইভারসিটি হলো সৃজনশীল স্ফুলিঙ্গ সুযোগ।

তো এই ধারণার মাঝে তুমি কোথায়? ভালোভাবে চিন্তা করো। কারও পোশাক তোমার সঙ্গে ম্যাচ না করলে তুমি কি ভাবো যে, তাদের পোশাকের স্টাইল একদম আলাদা নাকি তারা গেঁয়ো প্রকৃতির।

কোনো দলের মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার ধর্মবিশ্বাস যায় না। তুমি কি তাদের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখো, নাকি তাদেরকে তোমার উদ্ভট বলে মনে হয়?

সত্যি হলো, ডাইভারসিটিকে সম্মান করা আমাদের অনেকের পক্ষে বেশ কঠিন, বিষয়টি নির্ভর করে ইস্যুর ওপর। যেমন, তুমি জাতিগত বা সাংস্কৃতিক ডাইভারসিটি মেনে নিলেও তাদেরকে নিচু চোখে দেখো, কারণ তাদের পরিধেয় বস্ত্র তোমার পছন্দ নয়।

আমরা সবাই সংখ্যালঘু

ভিন্নতাকে মেনে নেয়া সহজ হয়ে ওঠে যখন উপলব্ধিতে আসে, আমরা সবাই আসলে সংখ্যালঘু। আর আমাদের এ কথাও স্মরণে রাখা উচিত ডাইভারসিটি শুধু বাহ্যিক জিনিস নয়, এটি অভ্যন্তরীণ বিষয়ও বটে।

আমরা শিখি ভিন্নভাবে। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছো, তোমার বন্ধু অথবা

বোনের মস্তিষ্ক তোমারটার মতো কাজ করে না। ডা. টমাস আর্মস্ট্রং সাতটি দিকের কথা বলেছেন এবং বলেছেন এভাবে বাচ্চারা শিখতে পারে।

* ভাষা বিদ্যা : পাঠ, লেখা এবং গল্প বলার মাধ্যমে শেখা—
* লজিকাল ম্যাথমেটিক্যাল: যুক্তি, নকশা, ক্যাটাগরি, সম্পর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে শেখা।
* শারীরিক কাইনেসথেটিক : শরীরের স্পর্শের মাধ্যমে শেখা।
* ব্যাপনস্থল : ইমেজ এবং ছবি দ্বারা শেখা।
* মিউজিকাল : শব্দ এবং ছন্দের দ্বারা শেখা।
* আন্ত:ব্যক্তিগত : অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখা।
* ইন্ট্রাপার্সোনাল : নিজের অনুভূতির মাধ্যমে শেখা।

একটির চেয়ে আরেকটি ভালো তা কিন্তু নয়, শুধু ওগুলো আলাদা। তুমি হতে পারো লজিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল কর্তৃত্বসুলভ, তোমার বোন হতে পারে ইন্টারপার্সোনাল অধিকারী। বিষয়টি নির্ভর করে ডাইভারটিকে কে কীভাবে দেখছো তার ওপর। তুমি বলতে পারো তোমার বোন খুব অদ্ভুত, কারণ সে বড্ড বাচাল প্রকৃতির কিংবা ওইসব ভিন্নতা থেকে সুযোগ সুবিধাগুলো নিয়ে তুমি তাকে বক্তৃতার ক্লাসে সাহায্য করতে পারো।

আমরা আলাদাভাবে দেখি। সবাই পৃথিবীটাকে আলাদাভাবে দেখে এবং নিজেদের ও অন্যদের সম্পর্কে রয়েছে ভিন্ন প্যারাডাইম। তুমি যখন বুঝতে পারবে প্রতিটি মানুষ ভিন্নভাবে পৃথিবীটাকে দেখে তাহলে তোমার বুঝবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণকে সম্মান করতে শিখবে।

নিজের ডাইভারসিটিকে সম্মান করো

আমাদের প্রবণতা হলো জিজ্ঞেস করা কোন ফলটি সবচেয়ে ভালো? জবাব হলো, এটি বোকার মতো একটি প্রশ্ন।

আমরা তিন ভাই। যদিও চেহারার অনেক কিছুতেই আমাদের মিল রয়েছে যেমন আমাদের নাকগুলোর গঠন একই রকমের কিন্তু আমরা আলাদা। ছেলেবেলায় সবসময় প্রমাণ করার চেষ্টা করতাম আমি আমার ভাইদের চেয়ে বেশি প্রতিভাবান। এসব চিন্তাভাবনা ছিল বোকার মতো। ওদের শক্তি ছিল ওদের মতো, আমারটা আমার মতো। কেউ কারও চেয়ে ভালো বা মন্দ নয়, শুধু পার্থক্য রয়েছে।

কাজেই বিপরীত লিঙ্গের কেউ যদি (যার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার জন্য তুমি

মরিয়া) তোমার সঙ্গে বাইরে যেতে না চায় মন খারাপের কিছু নেই। তুমি হয়তো চাইছো একটি রসালো আঙ্গুর, কিন্তু সে হয়তো এ মুহূর্তে চাইছে একটি কলা। তুমি বরং সবার মধ্যে মিশে না গিয়ে আলাদা আছো, আলাদাই থাকো নিজের ভিন্নতা নিয়ে। ফ্রুট সালাদ দেখতে অনেক সুস্বাদু, কারণ এতে প্রতিটি ফলের স্বাদ পাওয়া যায় আলাদাভাবে।

ভিন্নতাকে সম্মান দেখাতে রোড ব্লক

ঐকতানে অনেক বাধা-বিপত্তি থাকলেও তিনটে রোড ব্লক প্রধান। এগুলো হলো অজ্ঞতা, দলাদলি এবং প্রেজুডিস।

অজ্ঞতা

অজ্ঞতার মানে তোমার কাছে কোনো ক্লু নেই। তুমি জানো না অন্য লোকে কী বিশ্বাস করছে, তাদের আবেগ অনুভূতি সম্পর্কে তুমি জ্ঞাত নও, তারা কী ভাবে এবং তোমার কোনো ধারণা নেই তারা কীসের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে?

দলাদলি

যাদের সঙ্গে তুমি স্বচ্ছন্দবোধ করো, তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করায় কোনো সমস্যা নেই। তবে সমস্যা হয় যখন তোমার বন্ধুরা একচেটিয়া মনোভাব পোষণ করে এবং যারা তাদের মতো নয় তাদেরকে প্রত্যাখ্যান শুরু করে। এটিকে বলে দলাদলি। তখন অন্যরা নিজেদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে ভাবতে থাকে। আর তোমার বন্ধুরা ভোগে সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে। তবে দলাদলি ভেঙে ফেলা কোনো কঠিন কাজ নয়। এতে শুধু নিজের অহংবোধ বাদ দিয়ে অন্যদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করতে হবে।

প্রেজুডিস

নিজেকে কি কখনও স্টেরিওটাইপ বলে মনে হয়েছে অথবা কেউ তোমাকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেছে, তোমার গায়ের রঙ অন্যদের থেকে ভিন্ন, তোমার উচ্চারণ গেঁয়ো বা তুমি সীমানার অন্য প্রান্তে বাস করো বলে? আমাদের সবাই তো কমবেশি এরকমই, তাই না? এবং অতি অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়, যারা এমন করে ভাবে।

সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সমানভাবে গড়ে তুললেও আমাদের সবার সঙ্গে সমান আচরণ করা হয় না। সংখ্যালঘুদের প্রচুর বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, কারণ তাদের জীবনটা প্রেজুডিসে ভরা।

'হাই'ওয়ের সন্ধান

যখন তোমার মস্তিষ্কে এ উপলব্ধি প্রবেশ করবে যে, ভিন্নতা একটি শক্তি, দুর্বলতা নয় এবং একবার যখন তুমি ভিন্নতাকে সম্মান দেখাতে প্রস্তুত হবে, তুমি পেয়ে যাবে 'হাই'ওয়ের সম্মান।

ঐকতান সমঝোতা বা সহযোগিতার চেয়েও বেশি। সমঝোতা হল ১+১ = ১.৫। সহযোগিতা ১+১=২। ঐকতান হলো ১+১=৩। এটি হলো সৃজনশীল সহযোগিতা। যেখানে সৃজনশীলতা শব্দটির ওপর জোর দেয়া হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার গঠনের সময় প্রতিষ্ঠাতাদের ঐকতানের প্রয়োজন হয়েছিল। উইলিয়াম পিটারসন নিউজার্সি প্ল্যান-এর প্রস্তাব দেন, যাতে বলা হয় জনসংখ্যা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সরকারের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাওয়া উচিত। এই পরিকল্পনায় ছোট ছোট রাজ্যগুলো উপকৃত হয়েছিল। জেমস ম্যারিসনের ছিল ভিন্ন আইডিয়া। একে বলে ভার্জিনিয়া প্ল্যান। এতে বলা হয় যেসব রাজ্যের জনসংখ্যা বেশি তাদের প্রতিনিধিত্বও বেশি হওয়া উচিত। এতে বড় রাজ্যগুলো উপকৃত হয়।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে শেষে তাঁরা এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান, যাতে সবাই খুশি থেকেছে। তাঁরা কংগ্রেসের দুটি শাখার কথা বলেন। একটি শাখা হবে সিনেট। যেখানে জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রতিটি রাজ্যে দু'জন প্রতিনিধি থাকবেন। অপর শাখাটি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ। যেখানে প্রতিটি রাজ্য জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধি পাবে।

এটিকে গ্রেট কম্প্রোমাইজ বলা হলেও এই বিখ্যাত সিদ্ধান্তটিকে আসলে গ্রেট সিনার্জিই বলা উচিত, কারণ এটিতে দুটি প্রস্তাবেরই ভালো দিকগুলো রয়েছে।

ঐকতানের পথে

ঐকতান পাবার কতোগুলো রাস্তা আছে। সেগুলো হলো :

* সমস্যা বা সুযোগকে সংজ্ঞায়িত করা
* তাদের মতামত
(অন্যদের আইডিয়া আগে বুঝবার চেষ্টা করো)
* আমার মতামত
(তোমার আইডিয়া শেয়ার করে উপলব্ধির চেষ্টা করা)
* ব্রেইনস্টর্ম

(নতুন বিকল্প এবং আইডিয়া সৃষ্টি)

* হাইওয়ে

(সেরা সমাধানটি খুঁজে বের করো)

(একটি অ্যাকশন প্ল্যানের কথা বলা হলো। এ সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায় দেখা যাক।

ছুটি

বাবা : তুমি কী ভেবেছো তা নিয়ে চিন্তা করতে আমার বয়েই গেছে। তুমি চাও বা না চাও তুমি এই ছুটিটা আমাদের সঙ্গে কাটাচ্ছো। আমরা কয়েকমাস ধরে এটা নিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছি। এবং পরিবারের সবাই মিলে একত্রে সময় কাটানো খুবই জরুরি।

তুমি : কিন্তু আমি যেতে চাই না। আমি বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে চাই। না থাকলে সব মিস করবো।

বাবা : বাড়িতে তোমার একা থাকা চলবে না। সারাক্ষণ তোমার কথা চিন্তা করতে থাকলে আমার ছুটিটাই যাবে বরবাদ হয়ে। আমরা চাই তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।

সমস্যা বা সুযোগটাকে সংজ্ঞায়িত করো

এক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্যাটি রয়েছে তা হলো: আমার বাবা মা চাইছেন, আমাকে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে। কিন্তু আমি বাড়িতে থেকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে চাই।

তাঁদের মতামত (আগে অন্যদের আইডিয়া বুঝবার চেষ্টা করো)

৫নং অভ্যাসে শ্রবণের দক্ষতার বিষয়ে যা শিখলে তা এখানে প্রয়োগ করো। তাহলে বাবা-মাকে সত্যি বুঝতে পারবে। বাবা-মায়ের ওপর যদি তোমার শক্তি এবং প্রভাব থাকে তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন।

তাঁদের কথা শুনে তুমি যা শিখবে

এ ছুটিটি আমার বাবার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পরিবারের বন্ধনটাকে মজবুত করতে চান। এবং আমি তাঁদের সঙ্গে না থাকলে এটা হবে না, ভাবছেন তিনি। মা ভাবছেন আমাকে একা বাড়িতে রেখে গেলে তাঁরা দুশ্চিন্তা করবেন এবং ছুটিটা উপভোগ করতে পারবেন না।

আমার মতামত (তোমার আইডিয়া শেয়ার করে উপলব্ধির চেষ্টা করো)

এখন ৫নং অভ্যাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশ ব্যবহার করো এবং তোমার অনুভূতিগুলো শেয়ার করার সাহস দেখাও। তুমি তাঁদের কথা শুনলে তাঁরাও তোমার কথা শুনবেন। কাজেই বাবা-মাকে জানাও তোমার অনুভূতি।

বাবা-মা, আমি বন্ধুদের সঙ্গে বাড়িতেই থাকতে চাই। তারা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছি এবং এগুলো মিস করতে চাই না। তাছাড়া আমার ছোট ভাই এবং ছোট বোনটার সঙ্গে এক গাড়িতে গাদাগাদি করে বসতে হলে আমি পাগলই হয়ে যাবো।

ব্রেইনস্টর্ম (নতুন বিকল্প এবং রাস্তা সৃষ্টি করা)

এখানে জাদুকরী ব্যাপারটি ঘটবে। তোমার কল্পনা শক্তি ব্যবহার করো, নতুন আইডিয়া জানাও। ফলে নিজেকে আর একা মনে হবে না। ব্রেইনস্টর্মে নিচের টিপসগুলোর কথা মনে রেখো:

* **সৃষ্টিশীল হবে :** উদ্ভট যত আইডিয়া আছে সব মাথা থেকে বের করো। ওগুলোকে প্রবাহিত হতে দাও।

* **সমালোচনা এড়িয়ে চলো :** একমাত্র সমালোচনাই সৃষ্টিশীল এ প্রবাহকে ধ্বংস করতে পারে।

* **পিগিব্যাক :** সেরা আইডিয়াগুলো নিয়ে ইমারত বানাও। একটি আইডিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে অপর একটি আইডিয়াকে। ব্রেইনস্টর্মিংয়ের ফলে যেসব আইডিয়া তৈরি হতে পারে:

* বাবা বলেছেন, আমরা এমন একটি জায়গায় যাবো, যেখানে অনেক বেশি মজা করতে পারবো।

* আমি বলেছি, আমি কাছের আত্মীয়দের বাড়িতে থাকতে পারি।

* মা বলেছেন, আমি সঙ্গে একজন বন্ধু নিতে পারি।

* আমার সুবিধার জন্য মা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারেন।

* আমি বলেছি, আমি দু'একদিন বাড়িতে থেকে তারপর তাঁদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে চলে যাবো।

* বাবা আমাকে বাড়িতে থাকতে দিতে রাজি একটা শর্তে—তাঁরা ছুটিতে থাকার সময় আমাকে বাড়ির বেড়া রঙ করতে হবে।

হাইওয়ে (সেরা সমাধান খুঁজে বের করো)

ব্রেইনস্টর্মিংয়ের পরে সেরা আইডিয়াটি মাথায় সবচেয়ে বেশি কাজ করবে।

এখন এ আইডিয়ার সঙ্গে চলো।

আমরা সবাই একমত হয়েছি যে, সপ্তাহের অর্ধেক দিনগুলো আমি বাড়িতে থাকবো তারপর একজন বন্ধুকে নিয়ে পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের বাকি দিনগুলো ছুটি কাটাবো। বাবা বলেছেন, আমার বন্ধু এবং আমি মিলে যদি বাড়ির বেড়া রঙ করি তাহলে এজন্য পয়সা দেবেন। কাজটি কঠিন নয়, কাজেই এরপরেও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবো। তারাও খুশি, আমিও খুশি।

ওপরের ফর্মুলার বেসিক বা ভিতগুলো অনুসরণ করলে অবাক হয়ে দেখবে কী ঘটে। তবে ঐকতানে ম্যাচুরিটিরও প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদের দৃষ্টিকোণের কথাও তোমাকে শুনতে হবে। তারপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সাহস থাকতে হবে। অবশেষে তোমার সৃষ্টিশীলতার প্রবাহ শুরু হবে।

একটি মেয়ের গল্প বলছি, সে কীভাবে ঐকতানের সম্মান পেয়েছিল?

স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার পরে ডিস্কো অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। আমি একটি ফ্যাশন ম্যাগাজিনে পাওয়া একটি বিশেষ স্টাইলের ড্রেস পরতে চাইছিলাম। তবে সমস্যা ছিল, ড্রেসটি ছিল খাটো আর আমি অনেক লম্বা। জানতাম মা এটাকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

আমরা সেদিন সন্ধ্যায় বসে ডিস্কো নিয়ে কথা বলছিলাম। আমাকে কে ডিস্কোতে নিয়ে যাবে ইত্যাদি। আমি মাকে ম্যাগাজিনের পোশাকটি দেখালাম। এবং যা অনুমান করেছিলাম তাই হলো। মা বললেন, 'এ ড্রেসে চলবে না। এটা অনেক শর্ট।' তিনি মতামত দিলেন আমার কী করা উচিত এবং কোথায় শপিংয়ে যাওয়া উচিত?

মা'র কথা আমার পছন্দ না হলেও বুঝতে পারছিলাম, তিনি তাঁর মতামত থেকে একচুল নড়বেন না। তখন ভাবতে শুরু করলাম—কী করা যায়। শেষে মাথায় একটা বুদ্ধি এলো—মা যদি আমাকে কিছু বানিয়ে দেন তাহলেই আর সমস্যা থাকে না। আমরা দুজনেই সন্তুষ্ট হতে পরি। আমি দ্রুত আমার এক বন্ধুকে ফোন করলাম, তাকে নিয়ে দোকানে গেলাম। কাপড় কিনে আনলাম। তারপর মা আমাকে চমৎকার একটি ড্রেস বানিয়ে দিলেন। সেটি সবার থেকে আলাদা হলো। আমার বন্ধুরাও খুব পছন্দ করলো। বেশ চমৎকার কাটলো ডিস্কো অনুষ্ঠান।

টিম ওয়ার্ক এবং ঐকতান

চার-পাঁচজনকে নিয়ে দারুণ টিম বা দল গঠন করা যায়। প্রতিটি সদস্য আলাদা তবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে দলে।

* **প্লডার**—এরা ধীর এবং মন্থর গতিতে চললেও কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকে।
* **ফলোয়ার**—এরা খুব সাপোর্টিভ হয়। ভালো কোনো আইডিয়া পেলে ওটার বাস্তবায়নের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়।
* **ইনোভেটর**—এরা সৃজনশীল ধরনের মানুষ। এরা স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে।
* **শো-অফ**—এদের সঙ্গে কাজ করে মজাই আছে। তবে মাঝেমধ্যে একটু কাঠিন্য দেখায়। দলের সাফল্যের জন্য এরা উৎসাহ যোগায়।

একটি চমৎকার টিমওয়ার্ক একটি দারুণ সঙ্গীতের মতো। সবগুলো কণ্ঠ এবং যন্ত্র একসঙ্গে গাইতে এবং বাজতে শুরু করে আর তারা কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। আলাদাভাবে কণ্ঠ এবং যন্ত্রগুলো ভিন্ন শব্দ ও সুর সৃষ্টি করে তবে একসঙ্গে মিশে গিয়ে নতুন সাউন্ড তৈরি করে। এটাই হলো ঐকতান।

আমার এ বইটি ঐকতানের ফসল। প্রথমে যখন লেখার সিদ্ধান্ত নিই, খানিক বিভ্রান্তিতেই পড়ে গিয়েছিলাম। কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। শেষে সাহায্য নিতে শুরু করলাম। এক বন্ধুর কাছে সবার আগে সাহায্য চাইলাম। তারপর একটি দল গঠন করলাম। কয়েকটি স্কুল এবং কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললাম। তারা বিভিন্ন সময় আমাকে ফিডব্যাক প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি আলাদাভাবে আবার দলগতভাবে কিশোর-কিশোরীদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করলাম। একজন চিত্রশিল্পী ভাড়া করলাম। বইয়ের ৭টি অভ্যাস নিয়ে টিনেজারদের কাছে গল্প শুনতে চাইলাম। শেষে এ বইটি সৃষ্টিতে শতাধিক লোক জড়িয়ে পড়লো।

আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যেতে লাগলো। প্রতিটি মানুষ যে যার প্রতিভার স্বাক্ষর প্রমাণ করতে থাকলো, নানানভাবে তারা অবদান রাখলো এ বইয়ের জন্য। আমি যখন বই লেখায় ব্যস্ত তারা তখন যে কাজটি তারা ভালো পারে সেটি করে গেল। কেউ গল্প সংগ্রহে ওস্তাদ। সে সেটাই করলো। আরেকজন বই সম্পাদনা জানে। সে তাই নিয়ে ব্যস্ত হলো। এদের কেউ ছিল প্লডার, কেউ ইনোভেটর, আবার কেউ শো-অফ। এটি টিমওয়ার্ক এবং ঐকতানের চমৎকার সমন্বয়।

টিমওয়ার্ক এবং ঐকতান মিশে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বাস্কেটবল অলিম্পিয়ান ডেবোরা মিলার পালমোর বলেছেন, 'তুমি যখন জীবনের সেরা খেলাটি খেলো, তখন টিমওয়ার্কের কথাটাই তোমার মনে থাকবে। তুমি খেলা, শট বা স্কোর হয়তো ভুলে যাবে কিন্তু টিমমেটদের কথা কখনো ভুলবে না।'

ছোট ছোট পদক্ষেপ

১) কোনো বিকলাঙ্গ ক্লাসমেট বা পড়শীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাদের জন্য দুঃখবোধ করো না বা এড়িয়ে যেয়ো না, এজন্য যে ওদেরকে কী বলবে তা ভেবে পাচ্ছ না। বরং ওদের সঙ্গে গিয়ে পরিচিত হও।

২) পরেরবার বাবা-মা'র সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতের অমিল হলে ঐকতানের অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে কাজ করবে। ১. সমস্যাটি চিহ্নিত করবে। ২. তাঁদের কথা শুনবে। ৩. তোমার দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করবে। ৪. ব্রেইনস্টর্ম করবে। ৫. সেরা সমাধানটি খুঁজে বের করবে।

৩) প্রাপ্তবয়স্ক যে মানুষটিকে তুমি বিশ্বাস করো তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারো। দৃষ্টিভঙ্গির বিনিময় হয়তো তোমার সমস্যার সমাধান নতুন দিক নির্দেশ করতে পারবে।

৪) এ সপ্তাহে নিজের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখো কতোটা ঐকতান ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটা, টিমওয়ার্ক ইত্যাদি।

৫) কাউকে দেখলে তোমার বিরক্তি লাগে এমন কারও কথা চিন্তা করো। এদের মধ্যে ভিন্ন বা আলাদা ব্যাপার কী আছে? তুমি ওদের কাছ থেকে কী শিখতে পারো—

৬) তোমার বন্ধুদের সঙ্গে ব্রেইনস্টর্ম করো এবং মজার কিছু আবিষ্কার করো। নতুন কিছু। পুরাতনকে বাদ দাও।

অভ্যাস ৭

করাতটাকে ধারালো করো
এখন 'আমার সময়'



রোদ থাকতে থাকতেই ছাদ মেরামত করো

–জন. এফ. কেনেডি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

কখনও কি নিজেকে ভারসাম্যহীন, ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে? যদি জবাব হয় হ্যাঁ, তাহলে ৭নং অভ্যাসটি তোমাদের পছন্দ হবে। কারণ এটির নকশা বিশেষভাবে করাই হয়েছে এসব সমস্যায় সাহায্য করার জন্য। যাকে আমরা বলতে পারি 'করাত ধারালো করো।' কল্পনা করো যে তুমি জঙ্গলে হাঁটতে গিয়ে এক লোককে দেখতে পেলে যে, পাগলের মতো একটা করাত দিয়ে গাছ কাটার চেষ্টা করছে।

'কী করছেন, ভাই?' জিজ্ঞেস করলে তুমি।

'করাত দিয়ে গাছ কাটার চেষ্টা করছি।'

'কতোক্ষণ ধরে?'

'চার ঘণ্টা হলো,' জবাব দিল লোকটা। থুতনি বেয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে।

'আপনার করাত তো দেখছি ভোঁতা,' বললে তুমি। 'কাজে একটু বিরতি দিয়ে এটাকে ধার করে নিন না?'

'পারবো না। আরে বোকা, দেখছো না আমি গাছ কাটতে ব্যস্ত।

আমরা বুঝতে পারছি এখানে আসল বোকা কে? লোকটা যদি মিনিট পনের কাজে বিরতি দিয়ে করাতটা ধার করে নিতো, তাহলে তিনগুণ দ্রুত গতিতে গাছটি কাটতে পারতো।

শরীরের যত্ন নাও

বয়ঃসন্ধিকালে তোমার গলার স্বর বদলে যাবে, হরমোন বৃদ্ধি পাবে, শরীরের পেশি বাড়বে। নতুন শরীরকে স্বাগতম!

তোমার এ শরীর একটি দারুণ যন্ত্র। তার তুমি যত্নও করতে পারো, আবার অবহেলা বা অপব্যবহারও করতে পারো। একে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারো অথবা এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারো। সংক্ষেপে, তোমার শরীর একটি যন্ত্রাংশ। এর ঠিকঠাক যত্ন নিলে এটি তোমার চমৎকার সেবা করবে।

দশটি পথ রয়েছে, যার সাহায্যে কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের শরীর ঠিক রাখতে পারে।

১. ভালো খাবার খাও
২. বাথটাবে রিলাক্স করো
৩. সাইকেল চালাও
৪. ওয়েট লিফটিং করো
৫. পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাও
৬. যোগ ব্যায়াম করো
৭. খেলাধুলা করো
৮. হাঁটাহাঁটি করো
৯. স্ট্রেচ আউট করো
১০. অ্যারোবিক্স করো

সুস্বাস্থ্যের জন্য চারটি জিনিসের খুব প্রয়োজন—সুনিদ্রা, ফিজিকাল রিলাক্সেশন, ভালো খাবার এবং ব্যায়াম। ভালো খাবারের মধ্যে রয়েছে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি। সঙ্গে প্রচুর সব্জিও খেতে হবে।

ব্যবহার করো নতুবা খুইয়ে ফেলবে

আমার খুব প্রিয় একটি সিনেমা ফরেস্টগাম্প। গল্পটি আলাবামার এক সহজ সরল তরুণকে নিয়ে। সে খুব বড় হৃদয়ের মানুষ। তবে কিছুতেই জীবনে সাফল্য পাচ্ছিলো না বলে হতাশ হয়ে পড়ে। কী করবে ভেবে পায় না। শেষে সে দৌড় শুরু করে এবং দৌড় প্রাকটিস অব্যাহত রাখে। এক কোস্ট থেকে আরেক কোস্টে সে দৌড়াতো। অবশেষে ফরেস্টের মনের হতাশা কেটে যেতে থাকে এবং সে জীবনের মানে খুঁজে পায়।

আমরা সকলেই কোনো না কোনো সময় হতাশায় ভুগি, বিভ্রান্ত হই অথবা কাজকর্মের প্রতি হারিয়ে ফেলি আগ্রহ। অথচ এ সময়েই আমরা আমাদের সেরা কাজটি করতে পারি, যেটি করেছিল ফরেস্ট গাম্প। আমরা এক্সারসাইজ করতে পারি। এক্সারসাইজ শুধু হার্ট এবং ফুসফুসের জন্য উপকারিই নয়, ব্যায়াম তোমাকে দেবে দারুণ শক্তি, উৎকণ্ঠা দূর করবে, পরিষ্কার করবে মন।

এক্সারসাইজ নানাভাবেই করা যেতে পারে। অনেক টিনেজার খেলাধুলা করে। আবার কেউ সকালে দৌড়াতে পছন্দ করে, হাঁটে কিংবা সাইকেল চালায়, অ্যারোবিক্স করে, ওয়েট লিফটিং করে। সবচেয়ে ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে

অন্তত তিন দিন কুড়ি থেকে ত্রিশ মিনিট এক্সারসাইজ করা উচিত। তবে ব্যায়াম করতে গিয়ে আবার বডি বিল্ডার হওয়ার চেষ্টা কোরো না। বডি বিল্ডার ছাড়াই সুগঠিত দেহের অধিকারী হওয়া যায়।

আমি চাইলেই বদ অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারি

শরীরকে যেমন যত্ন করে গড়ে তোলা সম্ভব, আবার তাকে ধ্বংসও করা যায়। আর এজন্য মদ, মাদক এবং ধূমপানে আসক্ত হওয়াই যথেষ্ট। যারা মদ পান করে তাদের জীবনে সাধারণত তিনটি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে: গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট, আত্মহত্যা এবং খুন। আর যারা ধূমপান করে তাদের চোখের অনেক ক্ষতি হয়, ত্বক বুড়োদের মতো ঝুলে পড়ে, হলুদ হয়ে যায় দাঁত, নিঃশ্বাসে দেখা দেয় দুর্গন্ধ। আর ক্যান্সারের ভয়তো আছেই।

কেউ প্ল্যান করে নেশাগ্রস্ত হয় না। হঠাৎ করেই এটা ঘটে যায়। অনেকে নিজেদের 'স্বাধীন' প্রমাণ করতে মদ্য পান, ধূমপান করে, নেশার জিনিস খায়। তারপর দেখা যায় এতে তারা আসক্ত হয়ে পড়েছে।

নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ার মস্ত বিপদ হলো, নেশার কাছে নিজেকে সমর্পণ। নেশা যখন বলে 'লাফাও', তুমি লাফ দাও। আমি অনেককে দেখেছি অফিসে ধূমপান নিষেধ বলে রাস্তায় গিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। দেখে খারাপ লাগে কাঠফাটা রোদে কিংবা প্রবল ঠাণ্ডাতে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে ধূমপান করে। কারণ এ নেশার কাছে তারা হার মেনেছে।

আমরা মুখে বলি, নেশা হঠাৎ করে যেমন ধরা যায় তেমনি হুট করে ছাড়াও যায়। বাস্তবে কাজটি বড়ই কঠিন। ২৫ শতাংশ টিনেজার ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা করে পেরেছে, বাকিরা পারেনি, মার্ক টোয়েনকে সিগারেট ছাড়ার কথা বললে তিনি বলেছিলেন, 'আমি কতোবার এ নেশা ছেড়েছি!'

নেশাগ্রস্ত এক কিশোরের গল্প শোনা যাক সে কীভাবে এতে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে কী ঘটেছিল :

চৌদ্দ বছর বয়সে আমি প্রথম নেশা করি বা মদ খাই। এর আগে নেশা কী জিনিস জানতামই না। সবাই বলতো নেশা খুব খারাপ জিনিস। আমার বন্ধু বলত, 'আরে খেয়েই দ্যাখ না। মজা পাবি।' আমি খেয়ে দেখলাম। মজাও পেলাম তারপর নিয়মিত খেতে শুরু করলাম।

আমি যত নেশা করছিলাম এবং মদ খাচ্ছিলাম ততই আমার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছিল। সবার সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। আমার



পরিবারের কাছ থেকেও কমে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। আমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ কম হচ্ছিলো।

মদ্যপান এবং ড্রাগস নেয়ার পরে কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় আমার। সারাক্ষণ দুর্বল লাগতো। শরীরের ওজন কমে যাচ্ছিল দ্রুত। দুই মাসে আমি ত্রিশ পাউন্ড ওজন হারাই। আমি ছোটখাট ব্যাপারেও অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিলাম। যেমন টুথপেস্ট ফুরিয়ে গেলেও রাগারাগি করতাম। আমি বদমেজাজী হয়ে উঠছিলাম।

আমার সপ্তদশ জন্মদিনের মাসখানেক বাদে স্কুলে ড্রাগসসহ ধরা পড়ি। কর্তৃপক্ষ আমাকে এক সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করেন। আমার তখন বোধোদয় হয় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা দরকার। আমি নেশা বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি।

আমি আমার পুরানো বন্ধুদের দেখা সাক্ষাৎ বাদ দিয়ে Alcoholics Anonymous (AA) এর মিটিং যেতে শুরু করি এবং একজন স্পন্সর পেয়ে যাই। সে আমাকে নেশা ছাড়াতে অনেক সাহায্য করেছে। এ প্রোগ্রামটি ছাড়া আমি নেশামুক্ত হতে পারতাম না।

এ প্রোগ্রামে থাকার সময় মনে হচ্ছিল, যেন জীবনের সেরা সময় কাটাচ্ছি। এখন আমি মদ খাই না। নেশা করি না। আবার শুরু করেছি পড়াশোনা। আমার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক এখন নিবিড়। আমি স্কুলে ফিরে এসেছি। এখন নিজের

যত্ন নিচ্ছি। আমি এখন সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি। আমার জীবনটাই গেছে বদলে। আমি এখন ভার্সিটিতে ভর্তির চিন্তাভাবনা করছি, যা আগে কল্পনাও করিনি। এখন ভাবতেও অবাক লাগে, কেন ছেলেমেয়েরা স্কুলে বসে নেশা করে। এটা সত্যি একটা বাজে অভ্যাস এবং বাজে জীবন।

যেভাবে নেশা প্রত্যাখ্যান করবে

নেশা ছাড়া সহজ নয় আগেই বলেছি। তবে নেশাকে 'না' বলার উপায় আছে। সেগুলো হলো;

১. প্রশ্ন করো : নিজেকে প্রশ্ন করো 'কেন আমি ধূমপান করতে চাই?'

আজ যদি নেশা করতে গিয়ে পটল তুলি, তখন?

২. যেসব সমস্যা হতে পারে সেগুলোর কথা বলো

'গাঁজা ভরে সিগারেট খাওয়া অন্যায়।'

'ধূমপানে আমার মুখে গন্ধ হবে।'

৩. পরিণতি কী হতে পারে ভাবো।

নেশা করলে তার পরিণতি কী হতে পারে তা নিয়ে ভাবো। মাদক হাতে আমি পুলিশের কাছে ধরা খেতে পারি।

'আজ রাতে মাতাল হয়ে গেলে সেই সুযোগটা অন্য কেউ নিতে পারে।'

৪. বিকল্প উপায় ভাবো

'চলো, একটা সিনেমা দেখে আসি।'

'আমি বরং ফুটবল খেলবো।'

তোমার ভবিষ্যত উন্মোচনের চাবিকাঠি

একবার এক সমীক্ষায় আমি একদল কিশোর-কিশোরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমাদের কীসে ভয়?' শুনে অবাক হয়েছি তাদের বেশিরভাগের ভয় স্কুলে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে কিনা তা নিয়ে, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবে কিনা কিংবা ভবিষ্যতে ভালো কোনো চাকরি পাবে কিনা, এসব নিয়েই তাদের উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ। একজন বলেছে, 'নিশ্চয়তা কী যে, আমরা ভালো চাকরি পাবো?'

তোমার এ সুযোগ লাখে একটা। অথবা তুমি শিক্ষিত মন তৈরি করতে পারো। একটি শিক্ষিত মন তোমাকে ভালো চাকরি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেবে।

শিক্ষিত মন কী? এটি স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেট নয়। শিক্ষিত মনকে দক্ষ

একজন ব্যালেরিনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। একজন ব্যালেরিনার নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। সে তার শরীর যেমন খুশি বাঁকাতে জানে, লাফঝাঁপ দিতে পারে। তার নির্দেশে শরীর লাফায়, মোচড় খায়। এবং ভাবে একটি শিক্ষিত মন ফোকাস করতে পারে, সমন্বয় করতে জানে, শিখতে পারে, বলতে পারে, সমালোচনা করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে জানে, আবিষ্কার করে, কল্পনা করে এবং আরও অনেক কিছুই করে। তবে এসব করতে হলে ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এটা এমনি এমনি ঘটবে না।

আমি পরামর্শ দেবো যত পারো পড়াশোনা করবে। স্কুল এবং কলেজের পড়াশোনা শেষে ভোকেশনাল কিংবা টেকনিক্যাল ট্রেনিং নাও, কোনো বাহিনীতে শিক্ষানবিশের কাজ করো—এটি তোমার সময় এবং অর্থ দুটিরই কাজে লাগবে ভবিষ্যতে। এটাকে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে দেখবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় পাশ একজন ছাত্র অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ আয় করে। পড়াশোনার টাকার জন্য ভেবো না। খুঁজলেই দেখবে অনেকরকম বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও এ ধরনের শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকে।

মনটাকে ধারালো করে তোলো

মনের বিস্তার ঘটানোর বহু রাস্তা রয়েছে। সবচেয়ে ভালো পথ হলো বই পড়া। ব্যায়াম শরীরের যে উপকার করে, বই পড়া মনের ঠিক একই কাজ দেয়। সবকিছুর ভিত্তিমূল হলো বই পড়া। আর বই পড়তে তো ভ্রমণ বা অন্যান্য কিছুর খরচও নেই। নিচে কয়েকটি উপায় বলে দেয়া হলো। এ উপায়গুলো অবলম্বন করলে তোমার মনটি আরও ধারালো হয়ে উঠবে :

* প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়বে
* ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার সদস্য হয়ে যাও
* ভ্রমণ করো
* গাছ লাগাও
* বুনো জীবন পর্যবেক্ষণ করো
* মজাদার এবং চিত্তাকর্ষক কোনো বিষয়ের লেকচারে যোগ দাও
* ডিসকভারি চ্যানেল দেখো
* লাইব্রেরিতে যাও
* খবর শোনো
* তোমার পূর্বপুরুষদের নিয়ে গবেষণা করো

* গল্প, কবিতা অথবা গান লেখো
* বোর্ড গেম খেলো
* বিতর্কে অংশ নাও
* দাবা খেলো
* জাদুঘরে যাও
* ক্লাসে মন্তব্য করো
* ব্যালে, অপেরা অথবা নাটক দেখতে যাও
* মিউজিকাল কোনো যন্ত্র বাজাতে শেখো
* বন্ধুদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা করো
* শব্দজট মিলাও
* সময় করে প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা ক্লাসের বাইরের বই পড়ো।

স্কুল পরবর্তী শিক্ষার অপশন

ডিগ্রি বা স্কুলে কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছো তা নিয়ে ভাবিত হতে হবে না। সুস্থভাবে চিন্তা করা শিখলেই ক্যারিয়ার এবং শিক্ষার প্রচুর অপশন এসে যাবে। অ্যাডমিশন অফিস এবং কোম্পানিগুলো তুমি কোন বিষয়ে পড়াশোনা করেছো তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। তারা দেখতে চায় তোমার মনটা সুস্থ কিনা। তারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র দেখতে চাইবে :

১. আকাঙ্ক্ষা : তুমি সুনির্দিষ্ট কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রোগ্রামে প্রবেশ করতে কতোটা ইচ্ছুক? এ চাকরিটি পাবার আকাঙ্ক্ষা তোমার কতোটুকু!

২. টেস্ট স্কোর : SAT, GCSE, AS এবং A লেভেলে তোমার ফলাফল কতোটা সন্তোষজনক?

৩. এক্সট্রা কারিকুলাম : তুমি অন্যান্য কী কাজে জড়িত ছিলে? (খেলাধুলা, ক্লাস, চার্চ, কমিউনিটি ইত্যাদি)।

৪. সুপারিশ পত্র : অন্যান্যরা তোমার সম্পর্কে কী ভাবছে?

৫. যোগাযোগে দক্ষতা : লেখালেখি এবং মৌখিকভাবে যোগাযোগে তুমি কতোটা দক্ষ?

চাকরির সাক্ষাৎকার

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাঁরা দেখতে চাইবেন তুমি তাদের লেভেলে সফল হতে পারবে কিনা। তোমার কোয়ালিফিকেশন স্কোর কম হলেও ভেবো না যে ওঁরা তোমাকে ফেলে দেবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তোমার অবস্থান শক্তিশালী হলে

তুমি ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতে পারো, অথবা প্রথম শ্রেণীর কোনো চাকরিও পেতে পার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া খুব কঠিন এরকম গুজবে ভীত হবে না। যতটা কঠিন ভাবছো ততটা কঠিন কিন্তু নয়, যদি তুমি তোমার আবেদনপত্রে বিশেষ কিছু দক্ষতার বিষয় উল্লেখ করতে পারো।

মানসিক বাধা

মস্তিষ্ক তৈরিতে কিছু বাধা তোমাকে টপকাতে হবে। সেগুলো হলো :

স্ক্রিনটাইম : স্ক্রিনটাইম হলো টিভি, কম্পিউটার, ভিডিও গেম বা সিনেমায় সময় কাটানো। এসবের পেছনে খানিকটা সময় ব্যয় করা যেতেই পারে তবে দীর্ঘসময় ধরে ইন্টারনেটে চ্যাটিং, ভিডিওগেম খেলা কিংবা টিভি দেখা তোমার মাথাটাকে ভোঁতা করে দিতে পারে। তুমি কি জানো অ্যাভারেজ টিনেজাররা সপ্তাহে কুড়ি ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় করে টিভি দেখে? তার মানে বছরের তেতাল্লিশ দিন এবং গোটা জীবনের আটটা বছর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু টেলিভিশন দেখে। তবে তুমি নিশ্চয় এ গড়পড়তা কিশোর-কিশোরীদের দলে পড়ো না। ভেবে দেখো, বছরের এই তেতাল্লিশটা দিন তুমি যদি উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করতে যেমন, ফরাসী ভাষা শিক্ষা, বলরুম ডান্স শেখা কিংবা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং—তাহলে কতো ভালো হতো?

টিভি, কম্পিউটার বা সিনেমার পেছনে কতোটা সময় ব্যয় করবে তা এক্ষুনি ঠিক করে নাও। দরকার হলে টিভির রিমোট কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলো। তাতেও কাজ হবে।

নার্ড সিনড্রোম : মজার ব্যাপার কিছু কিশোর-কিশোরী ক্লাসে খুব ভালো রেজাল্ট করতে চায় না, পাছে তাদেরকে সবাই 'নার্ড' বা 'পড়ুয়া' বলে উপহাস করে! আমি মেয়েদেরকে বলতে শুনেছি, খুব বেশি পড়ুয়ার কাছে তারা ঘেঁষে না, তাদেরকে ভয় পায় বলে। তুমি যদি পড়ুয়া স্বভাবের হও আর অন্যরা তোমাকে ভয় পায় তাহলে সেটা ওদের সমস্যা, তোমার নয়। আমি অনেক সফল এবং ধনবান মানুষকে চিনি যাদেরকে 'নার্ড' বলা হতো।

প্রেশার : মাঝে মাঝে স্কুলে আমরা ভালো রেজাল্ট করতে ভয় পাই প্রচণ্ড চাপের কারণে। আমরা যদি একবার ভালো রেজাল্ট করি তাহলে, পরিবারসহ সকলের প্রত্যাশা বেড়ে যায় এবং তারা ভাবে এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। তখন প্রেশার বা চাপ বৃদ্ধি পায়। আর রেজাল্ট খারাপ করলে কোনো প্রত্যাশা থাকে না, চাপও নেই।

শুধু একটা কথা স্মরণে রেখো : তুমি সেরা চেষ্টাটা করনি বলে রেজাল্ট ভালো হয়নি এটার চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল সফল হতে গিয়ে চাপ নেয়া। চাপ নিয়ে ভয় পেয়ো না। এ তুমি সামলে নিতে পারবে।

হৃদয়ের প্রতি যত্নশীল হও

একদিন বিকেলে আমার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লো কেউ।

আমি দরজা খুলে দেখি দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আমার উনিশ বছর বয়সী ছোট বোনটি। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে ভেতরে নিয়ে এসে। যদিও অনুমান করতে পারছি ঘটনা কী। কারণ, এ মাসে এ নিয়ে তিনবার সে চোখ লাল করে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরেছে।

'ও কী হৃদয়হীন!' নাক টানলো আমার ছোট বোন। হাতের চেটো দিয়ে লাল চোখের জল মুছলো। 'আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করেছে বিশ্বাসই হচ্ছে না। কী ছোট মন!'

'এবারে সে কী করেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তুমি তো জানো, ভাইয়া... ও আমাকে ওর বাসায় যেতে বলেছিল একসঙ্গে পড়াশোনা করবো বলে।' ফুঁপিয়ে উঠলো সে।

'আমরা পড়াশোনা করার সময় কয়েকটা মেয়ে আসে ওর সঙ্গে দেখা করতে। ও তখন এমন ভাব করছিল যেন আমাকে চেনেই না।'

'এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' জ্ঞানী লোকের মতো বললাম আমি। 'আমি এরকম কাজ বহুবার করেছি।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে তো আমি দুই বছর ধরে ডেটিং করছি', তোতলাচ্ছে আমার বোন। 'ওরা যখন জিজ্ঞেস করলো আমি কে? তখন বলে কিনা আমি ওর বোন।'

খাইছে!

ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে বেচারী। কিন্তু আমি জানি দুই একদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। ও আবার ওর বয়ফ্রেন্ডকে ভাবতে শুরু করবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

আমার বোনের মতো তোমাদের জীবনেও কি এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয়েছে? আবেগের রোলার কোস্টারে চড়ে একবার উপরে উঠে গিয়েছো, আবার নেমেছো? তোমার কি মনে হয়েছে, তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে মুডি মানুষ এবং নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না? যদি তাই হয় তাহলে ক্লাবে স্বাগতম।

কারণ, এ ধরনের আবেগ-অনুভূতি কিশোর-কিশোরীদের জন্য খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তোমার হৃদয় অত্যন্ত আবেগী জিনিস এবং মেজাজী। শরীরের মতো এরও নিয়মিত যত্ন-আত্তি করা উচিত।

হৃদয়ের পুষ্টি সাধনের জন্য প্রয়োজন সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর মনোযোগ দেয়া বা অন্য কথায় বলা যায়, তোমার রিলেশনশিপ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নিয়মিত সঞ্চয় করো, সেইসঙ্গে পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও।

PBA এবং RBA র ডিপোজিট একইরকম, যা আগে হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে। কারণ, তুমি অন্যদের অ্যাকাউন্টে যা ডিপোজিট করছো তা তোমার অ্যাকাউন্টেও একই সঙ্গে জমা হচ্ছে। কাজেই হৃদয়ের প্রতি যত্নশীল হও।

হাসো নইলে কাঁদতে হবে

সবকথা বলার পরেও শেষ একটি কথা বাকি থেকে গেল, তোমার হৃদয়কে সুস্থ-সবল রাখার জন্য। হাসো। হ্যাঁ... স্রেফ হাসো। *হাকুনা মাতাতা!* ডোন্ট ওরি, বি হ্যাপি। মাঝেমধ্যে জীবন পানসে হয়ে ওঠে এবং এটাকে বদলাবার মতো করার কিছু না থাকলে স্রেফ হেসেই উড়িয়ে দাও সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

আমরা যখন বুড়িয়ে যাই তখন ভুলে যাই, কোন জিনিসগুলো আমাদের জীবনকে জাদুকরী করে তুলেছিল। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তুমি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার বয়সে পৌছানো পর্যন্ত দিনে ৩০০ বার হাসো। আর সে তুলনায় বড়রা হাসে দিনে মাত্র ১৭ বার। এ কারণেই শিশুরা বেশি সুখী। আমরা কেন চেহারাটা এতো গম্ভীর করে রাখি? এর কারণ সম্ভবত আমাদেরকে শেখানো হয়েছে, হাসাহাসি বাচ্চামি ছাড়া কিছু নয়। প্রখ্যাত জেডাই মাস্টার ইয়োডার উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য, 'ভুলে যাও যে তুমি কী শিখেছো।' আমাদেরকে আবার হাসতে শিখতে হবে।

হিউমারের শক্তি নিয়ে লিস্টার ডসকচের একখানা বই পড়ছিলাম আমি 'Psychology Today' এ বইতে হাসি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলা হয়েছেঃ

হাসিতে যা হয়:

* মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করে এবং আরও সৃজনশীল চিন্তা করতে আমাদের শেখায়।
* জীবনের কঠিন দিকগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করে।
* উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাত্রা কমিয়ে দেয়।
* আমাদের হার্টবিট এবং রক্ত চাপ কমায়।

* অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগে সহায়তা করে, নিজেদেরকে পরিত্যক্ত মনে হওয়া থেকে রক্ষা করে। ডিপ্রেশন এবং আত্মহত্যা প্রবণতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।
* মস্তিষ্কের প্রাকৃতিক ব্যথা নিরাময়ক এনডোরফিন নির্গত হয় মন খুলে হাসলে।

হাসলে শরীর-স্বাস্থ্যও ভালো থাকে, রোগ নিরাময় হয়। আমি অনেক লোকের কথা জানি, যারা হাসির থেরাপি নিয়ে সিরিয়াস সব অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন। ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগাতেও হাসির জুড়ি নেই।

তুমি যদি তেমন না হাসো তাহলে শুরু করতে পারো কীভাবে? তোমাকে 'হিউমার কালেকশন' বৃদ্ধির পরামর্শ দেব। এর মধ্যে রয়েছে বইপত্র, কার্টুন, ভিডিও, আইডিয়া—যা তোমার কাছে হাস্যরসের মনে হবে তাই জোগাড় করবে। তারপর যখন মন খারাপ থাকবে, হাসির বই পড়বে কিংবা সিনেমা দেখবে। আমি নিজে হাসির সিনেমা দেখতে পছন্দ করি। আমি কিছু কমেডিয়ান অভিনেতার হাসির ভিডিও কিনে দেখি।

আত্মার যত্ন নাও

তোমার আত্মা কিসে আপ্লুত হয়? দারুণ কোনো সিনেমা দেখলে? ভালো কোনো বই পড়লে? তুমি কি এমন কোনো সিনেমা দেখেছো যা তোমাকে কাঁদিয়েছে? তোমাকে গভীরভাবে কী অনুপ্রাণিত করে? সঙ্গীত? শিল্পকলা? প্রকৃতির মধ্যে হারানো?

তোমার আত্মা তোমার কেন্দ্রভূমি যেখানে লুকিয়ে আছে প্রত্যয় এবং মূল্যবোধ। এসব মানসিক শান্তির উৎস। একে রিনিউ করো, জাগাও। প্রখ্যাত লেখক পার্ল এস বাক বলেছেন, 'আমার ভেতরে একটি জায়গা আছে, যেখানে আমি একা এবং ওখানে তুমি তোমার ঝর্ণাগুলোর নবজীবন দিতে পারো, যা কখনো শুকিয়ে যাবে না।

আত্মার খাদ্য

কৈশোরে আমি শক্তি পেতাম ডায়েরি লিখে, গান শুনে এবং পাহাড়ে একা একা বসে থেকে। আমার আত্মাকে নবজীবন দান করার এটি ছিল আমার পথ। যদিও তখন এসব নিয়ে তেমন ভাবতাম না। তাছাড়াও খ্যাতিমানদের বিভিন্ন উক্তি আমাকে শক্তি জোগাতো। যেমন মার্কিন কৃষি সেক্রেটারি জেরা ট্যাফট বেনসনের একটি কথা আমি কখনো ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন : 'নারী এবং পুরুষ যারা নিজেদের জীবন সমর্পণ করে ঈশ্বরের কাছে তারা দেখে, তিনি তাদের জীবন থেকে অনেক কিছু বের করে নিয়ে আসছেন, যা তারা নিজেরাও পারছে



না। ঈশ্বর তাদের আনন্দ গভীর করেছেন, দৃষ্টিসীমার বিস্তার ঘটাচ্ছেন, মনকে দ্রুতগামী করে তুলছেন, শক্তিশালী করে তুলছেন তাদের পেশী, তাদের স্পিরিট জাগিয়ে তুলছেন, তাদের 'আশীর্বাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন, বৃদ্ধি করছেন তাদের সুযোগ-সুবিধা এবং ঢেলে দিচ্ছেন শান্তি।'

আত্মা হলো তোমার জীবনের অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটি ক্ষেত্র। একে তো খোরাক দিতে হবে। কিছু টিনেজার আত্মার খোরাক হিসেবে নিচের আইডিয়াগুলো দিয়েছে :

* ধ্যান
* অপরের সেবা
* ডায়েরি লেখা
* হাঁটাহাঁটি
* অনুপ্রেরণামূলক বই পড়া
* ছবি আঁকা
* প্রার্থনা করা
* কবিতা অথবা গান লেখা
* গভীরভাবে চিন্তা করা
* উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এমন গান-বাজনা শোনা
* কোনো যন্ত্র বানানো
* ধর্মকর্ম করা

* যে বন্ধুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়, তার সঙ্গে কথা বলা
* লক্ষ্য বা মিশন স্টেটমেন্টের প্রতিফলন ঘটানো।

টিনেজারের বেস্ট ফ্রেন্ড

আত্মার খোরাক জোগাতে প্রকৃতির সঙ্গে বিলীন হওয়ার চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। শহরে বাস করলেও পার্কে যেতে পারো। আর গাঁয়ে বাস করলে যাবে নদীর ধারে। পার্কের সবুজ ঘাস কিংবা নদীর বাতাস তোমার মনটাকে প্রফুল্ল করে তুলবে।

আত্মার খোরাকের জন্য ডায়েরিও লিখতে পারো। এটি হতে পারে তোমার সান্ত্বনা, তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড যেখানে নিজের সমস্ত আবেগ অনুভূতি ঢেলে দিতে পারবে। তোমার রাগ, খুশি, ভয়, প্রেম, নিরাপত্তাহীনতা বা বিভ্রান্তি, সবকিছু ডায়েরির পাতায় লিখে ফেলবে। তুমি মন খুলে কথা বলতে পারবে ডায়েরির সঙ্গে। সে সব শুনবে। ডায়েরি তোমার সমালোচনা করবে না। তোমার মনের অগোছালো কথাগুলো ডায়েরিতে লিখে ফেলো। তাতে মনটন পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, নিজেই নিজের সাহায্য করতে পারবে।

আত্ম-সচেতনতা বাড়াতেও ডায়েরির বিকল্প নেই। এতে অতীতের কথা লেখা থাকে। তুমি বুঝতে পারবে তুমি কতোটা বড় হয়েছো, এক সময় কতোটা অপরিণত ছিলে কিংবা কোনো ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কীভাবে ধরা খেয়েছিলে। একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল, পুরানো ডায়েরি পড়ার পর সে আর তার অত্যাচারী বয়ফ্রেন্ডের কাছে ফিরে যায়নি। অথচ একসময় ফিরে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছিল।

ডায়েরি লেখার কোনো অনুষ্ঠানিকতা নেই। যে কোনোদিন এটা শুরু করা যায়। ওখানে যা খুশি লিখতে পারো। আমার পুরানো ডায়েরিগুলো ভরে আছে হিজিবিজি আঁকা ছবি, দুর্বল কবিতা আর অদ্ভুত গন্ধে।

ডায়েরির একটি নাম দিতে পারো তুমি। যা খুশি নাম। যেমন অ্যালিসন নামের একটি মেয়ে তার ডায়েরির নাম রেখেছে পবিত্র বাক্স। বেটি তার ডায়েরিকে সম্বোধন করে 'কৃতজ্ঞতার বই' হিসেবে। সে লিখেছে :

'আমার একটি নোটবুক আছে, যেটি আমাকে জীবনে আরও ইতিবাচক হতে শিখিয়েছে। এর নাম দিয়েছি কৃতজ্ঞতার বই। সারাদিনে আমার জীবনে কোনো ইতিবাচক ঘটনা ঘটলে কিংবা কোনো কারণে কোনো কিছু বা কারও প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলে আমি তা এ বইতে লিখে ফেলি। এ বইটি আমার জীবনটাকে বদলে

দিয়েছে এবং সবকিছু সুচারুভাবে দেখতে পারি। আমি শুধু ভালো দিকটা বেছে নিই, খারাপ নয়। এটি ঠিক প্রচলিত ডায়েরির মতো নয়, যেখানে তোমরা লেখো সারাদিন খারাপ কিংবা ভালো কী ঘটলো। তবে আমার আলাদা একটি ডায়েরিও আছে। সেখানে একটি পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আমার প্রিয় গানের কথা, প্রিয় স্পর্শের কথা (আমার ভাই যখন আমাকে আলিঙ্গন করে), প্রিয় শব্দ (আমার মায়ের হাসি), প্রিয় অনুভূতি (ঠাণ্ডা বাতাস) ইত্যাদি। আমি এ ডায়েরিতে ছোটখাটো বিষয়গুলোও লিখে রাখি। যেমন, ব্রায়ান আমার জন্য আজ টেবিল পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছে।' কিংবা 'জন আজ যাওয়ার পথে আমাকে দেখে 'হ্যালো' বললো। এসব ছোটখাট জিনিস আমাকে ভালো লাগায়। আমি এ ডায়েরি পড়ে অতীতে চলে যাই এবং স্মরণ করি, ভালো বিষয়গুলোর কথা, ভুলে যাই খারাপ বিষয়গুলো। ওগুলো মন থেকে মুছে ফেলি, খারাপ কিছু আমাকে আর প্রভাবিত করতে পারে না।

বাস্তববাদী হও

এ অধ্যায়ের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা। যাওয়ার আগে শেষ কথাগুলো বলে যাই। একবার ক্লারিসা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে করাত ধারালো করার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম। সে আমাকে উল্টো কিছু উপদেশ বর্ষণ করলো। বললো, 'বাস্তববাদী হও, শন। কার এতো সময় আছে? আজ সারাদিন আমাকে স্কুলে থাকতে হয়েছে। স্কুল শেষে বাড়িতে আমার কাজ আছে। তারপর সারারাত আবার পড়াশোনা করতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হলে পরীক্ষায় ভালো মার্কস পেতে হবে। তো আমি কী করবো, তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি এবং তারপর আগামীকালের অংক পরীক্ষায় ফেল করি?'

আমিও তাই বলি। সবকিছুর জন্য সময় আছে। ভারসাম্য রক্ষা এবং ভাসাম্যহীনতা হওয়ার জন্য সময় আছে। এমন সময় আসবে, যখন কম ঘুমিয়ে তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে। আবার শুধু জাঙ্ক ফুড খেয়ে উপোস করারও সময় আছে। এটাই বাস্তব জীবন। তবে রিনিউয়াল বা নয়া শুরুর জন্যও সময় আছে।

খুব বেশি কঠিনভাবে এগোতে থাকলে তুমি পরিষ্কারভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারবে না। তুমি বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়বে, সঠিক দৃষ্টি হারিয়ে ফেলবে। তুমি হয়তো ভাবতে পারো তোমার অনুশীলন করা, বন্ধুত্ব গড়ে তোলা কিংবা অনুপ্রাণিত হওয়ার সময় নেই। বাস্তবে কিন্তু এটা আছে। তুমি যদি তোমার করাত

ধারালো করতে পারো, তার ফল তো পাবেই। কারণ তুমি যখন তোমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছো, তখন কিন্তু করাতটা আরও বেশি ধারালো করে তুলতে পারছো।

তুমি পারবে

তুমি হয়তো ইতিমধ্যে অজান্তেই অনেক করাত ধারালো করে ফেলছো। তুমি যদি স্কুলে কঠোর পরিশ্রম দিয়ে থাকো, তুমি তোমার মন ধারালো করে তুলছো। যদি তুমি খেলাধুলা করো অথবা ব্যায়াম করো, তুমি তোমার শরীরের যত্ন নিচ্ছো। তুমি যদি বন্ধুত্বের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাও তাহলে নিজের হৃদয়ের যত্ন নিচ্ছো। একবার তুমি একাধিক করাত ধারালো করে তুলতে পারো। মেলানি আমাকে বলেছে সে ঘোড়ায় চড়তো। এতে তার শরীরের ব্যায়াম হতো। আর ঘোড়ায় চড়ার সময় সে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকতো। এতে তার মনের অনুশীলন হতো। আর প্রকৃতির মধ্যে থাকার কারণে শান্তি পেত আত্মা। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আর রিলেশনশিপ? ঘোড়ায় চড়লে তোমার হৃদয়ের কী উন্নয়ন ঘটছে?' সে জবাব দিয়েছে, 'আমার ঘোড়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো।' আমার মনে হয় ঘোড়ারাও মানুষ হতে পারে।

করাতে ধার দেয়ার ব্যাপারটি হুট করেই তোমার জীবনে ঘটবে না। তোমাকে প্রো-এ্যাকটিভ হতে হবে এবং তখন এটি ঘটবে। সবচেয়ে ভালো হয় প্রতিদিন সময় নাও করাত ধার করার জন্য, পনের থেকে ত্রিশ মিনিট হলেও চলবে। কিছু টিনেজার এ জন্য সময়টাকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে—ভোরবেলা, স্কুলের পরে কিংবা গভীর রাতে। তবে তখন একা থাকতে হবে। সেটা তুমি চিন্তার সাগরে ডুবে থাকো কিংবা এক্সারসাইজ করো, যা খুশি। কেউ কেউ সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কাজটা করে থাকে। তোমার যখন সময় হবে, করবে।

আব্রাহাম লিংকনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনাকে যদি আট ঘণ্টা সময় দেয়া হয় একটি গাছ কাটার জন্য আপনি তখন কী করবেন?'

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি প্রথম চার ঘণ্টা ব্যয় করবো আমার করাত ধারালো করে তুলবার জন্য।'

ছোট ছোট পদক্ষেপ

শরীর

১) সকালে নাশতা খাবে।

২) আজ থেকে ব্যয়াম শুরু করে দাও এবং টানা ত্রিশদিন চালিয়ে যাও। হাঁটো, দৌড়াও, সাঁতার কাটো, সাইকেল চালাও, ওয়েট লিফটিং করো যা খুশি। এমন কিছু বেছে নেবে, যা তোমার কাছে উপভোগ্য মনে হয়।

৩) এক সপ্তাহের জন্য খাদ্যাভাস ত্যাগ করো। ভাজাপোড়া, কোল্ড ড্রিংকস, মিষ্টি, চকোলেটসহ যেসব খাবার তোমার শরীরের জন্য ক্ষতিকর তা এড়িয়ে চলো। এক সপ্তাহ পরে দেখবে কেমন লাগছে তোমার।

মন

৪) এমন কোনো পত্রিকার গ্রাহক হয়ে যাও, যা তোমার মনকে শাণিত করে তুলতে পারবে। যেমন *পপুলার মেকানিক্স* কিংবা *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক*।

৫) প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়বে। হেডলাইন স্টোরি এবং কলামগুলো পড়বে।

৬) পরেরবার যখন ডেটিংয়ে যাবে, বন্ধু বা বান্ধবীকে নিয়ে জাদুঘর ঘুরে এসো। নিজের দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্ত প্রসারিত করো।

হৃদয়

৭) বাবা-মা, ভাই-বোনের সঙ্গে বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে এসো। ফুটবল খেলা দেখো, সিনেমা দেখতে যাও, শপিংয়ে যাও কিংবা আইসক্রিম কিনে খাও।

৮ তোমার হিউমার কালেকশন তৈরি করো। প্রিয় কার্টুন কেটে রাখতে পারো খবরের কাগজের পাতা থেকে, হাসির ছবির ভিডিও জোগাড় করতে পারো অথবা জোকসের বই। যখন মন খারাপ থাকবে বা মনের ওপর চাপ পড়বে, এগুলো তোমার মন ভালো করে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আত্মা

৯) আজ সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখো অথবা খুব ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখো।

১০) ডায়েরি লেখার অভ্যাস না থাকলে আজ থেকে শুরু করো।

১১) প্রতিদিন ধ্যান করবে। প্রার্থনা করবে। যা তোমার কাজে আসবে তা-ই করবে।

ব্যর্থ হওয়ার ত্রিশটি প্রধান কারণ এগুলোর কতোটি তোমাকে পিছনে ধরে রেখেছে?

যেসব পুরুষ ও নারীরা তাদের সর্বাত্মক আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও ব্যর্থ হয় তাদের ঘটনার চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর হয় না! এটা কেন দুঃখজনক? যদি তুমি অল্প কিছু সফল লোকের সাথে তুলনা করো তবে এটা হয়তো দুঃখজনক একটি ঘটনা।

আমি কয়েক হাজার পুরুষ ও নারীদের বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছি, তাদের ৯৮% যাদেরকে শ্রেণিভুক্ত করেছি 'ব্যর্থ' রূপে। আসলে আমি দেখলাম, আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিছু মৌলিক ভুল রয়েছে, যা ৯৮% লোকজনকে জীবনে ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দিচ্ছে। কিন্তু আমি এই বইটি এই উদ্দেশ্যের প্রতি লিখিনি যে, বিশ্বের ঠিকগুলো ও ভুলগুলোকে আদর্শায়িত করবো; সেইজন্য হয়তো এই বইয়ের চেয়ে একশ গুণ বড় বইয়ের প্রয়োজন।

আমার বিশ্লেষিত কাজ প্রমাণ করেছে যে, সেখানে ব্যর্থতার ত্রিশটি প্রধান কারণ রয়েছে এবং সাফল্য লাভের জন্য তেরোটি প্রধান সূত্র রয়েছে, যার মাধ্যমে লোকজন নিজেদের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। সাফল্যের অনেকগুলো সূত্র নিয়েই এই বই। প্রতিটি অধ্যায়ে এক একটি সূত্রের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর এখানে ব্যর্থতার ত্রিশটি প্রধান কারণের বর্ণনা করা হলো। তুমি যখন তালিকাটির ওপর দিয়ে যাবেন, তখন এটা দ্বারা নিজেকে খুঁজে দেখো, একদম আগা থেকে গোঁড়া, এই উদ্দেশ্য আবিষ্কারের জন্য যে, তুমি ও তোমার সাফল্যের মধ্যে এগুলো কতোটি ও কোনটি দাঁড়িয়ে আছে?

১। **প্রতিকূল জন্মগত অবস্থা :** মস্তিষ্কজনিত সমস্যা নিয়ে অনেকে জন্মগ্রহণ করে। সেটা খুব একটা ভালো অবস্থা নয়। তারপরেও সুযোগ আছে, তবে অল্প। তবে এই ত্রুটিকেও জয় করে সাফল্য অর্জন করা যায়। এই ত্রুটিকে জয় করতে হলে দরকার ঐকামন দল। আপানর ঐকামন দল এই ত্রুটি দূর করে আপনার ও আপনার সাফল্যের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে। সেতুবন্ধন মানে নদীর অপর পাড়ে একটি

চর বা অঞ্চলকে বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে উন্নত ও শক্তিশালী করতে একটি সেতু নির্মাণ করা। এই সেতুবন্ধন উভয় পাশের অঞ্চলকে লাভবান ও সম"দ্ধ করে। নিজের লাভের জন্য পর্যবেক্ষণ করুন। যাই হোক, এই একটিই হচ্ছে, একমাত্র যা ব্যর্থতার ত্রিশটি কারণের মধ্যে হয়তো কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি দ্বারা সহজভাবে সংশোধন করা যায় না।

২। **মধ্যম অবস্থার ওপরে লক্ষ্য না নেওয়া এবং উচ্চাশার অভাব :** আমরা কোনো আশার প্রস্তাব করতে পারি না ব্যক্তিটির প্রতি, যিনি এতোটা উদাসীন যে, জীবনে সামনে এগিয়ে যেতে চাও না এবং যিনি একটি নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার দাম দিতে ইচ্ছুক নয়। দেশের বহু তরুণই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিতে অনাগ্রহী। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, অনেক কাজ, অনেক কিছু করতে হবে, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিলে কী হবে? কিন্তু তোমার যদি একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য না থাকে, তাহলে তুমি অনেক কাজ করেও সবশেষে পৌছবে কোথায়? এজন্যই তারা কোনো একটি কাজ আরম্ভ করে, একটু কাজ করে, তারপর ছেড়ে দেয়, হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু মুখে বলে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। অবশেষে আমি একজনকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিতে সহায়তা করেছি। তবে পাঠক হিসেবে তুমি নিজেও আপনার নিজের জীবনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দেখতে পারো যে, এটা কতোটা কার্যকরী ও অবাক করা সাফল্য লাভ করা যায়। আমার বিশ্বাস তুমিও অবাক হবে।)

৩। **অপর্যাপ্ত শিক্ষা :** এই একটি প্রতিবন্ধকতা যা তুলনামূলক সহজভাবে অতিক্রম করা যায়। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, সর্বোৎকৃষ্ট-শিক্ষিত লোকজন হচ্ছে তারাই, যারা স্ব-শিক্ষিত বা 'স্ব-নির্মিত', নিজেই নিজেকে নির্মাণ করেছে। এটা তৈরি করতে হলে একটি কলেজ ডিগ্রির চেয়েও বেশি শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে নিতে হয়। যে কোনো ব্যক্তি যিনি স্বশিক্ষিত, তিনি অন্যদের অধিকারগুলো লঙ্ঘন না করে তার জীবনে তিনি যা চান, তা পেতে শিখেছে। শিক্ষা আসলে গঠিত হয় অনেক বেশি জ্ঞান দিয়ে নয়; বরং সেই জ্ঞান দিয়ে, যা কার্যকরভাবে ও অধ্যবসায়ী ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। একজন মানুষ কতোটা জানে, কেবল তার ভিত্তিতে তাকে বেতন দেওয়া হয় না; বরং সে যতটা জানে, তা দিয়ে সে কী করে, সেই ভিত্তিতে তাকে মূল্যায়ন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো রাজ্যের ডেনভারে লেখকদের মিলনমেলা নামক একটি জায়গা আছে, সেখানে একজন ব্যক্তির স্ব-শিক্ষিত বা 'স্ব-নির্মিত' অবস্থার প্রতীকস্বরূপ একটি ভাস্কর্য আছে। কোনোদিন যদি তুমি সেখানে যাও তাহলে তা দেখতে পাবে।

৪। **আত্ম-শৃঙ্খলার অভাব :** শৃঙ্খলা আসে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ থেকে। এটার মানে

একজন মানুষকে তার সকল নেতিবাচক গুণাবলিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তোমার আশেপাশের অবস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করার পূর্বে, তোমাকে অবশ্যই প্রথমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্ব-কর্তৃত্ব মানে নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে কঠিনতম লড়াই, যাতে তোমাকে জয়ী হতেই হবে। যদি আপনি আপনার আত্মাকে মানে নিজেকে অধ্যবসায় দ্বারা বশীভূত করতে না পারো, তাহলে তুমি নিজের দ্বারাই পরাভূত হবে। আপনি হয়তো নিজেকে একই সাথে সবচেয়ে বড় বন্ধু ও সবচেয়ে বড় শত্রুরূপে দেখবে। অনেকেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমিই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু'। এটার কারণ আত্ম-শৃঙ্খলার অভাব।

৫। **অসুস্থ স্বাস্থ্য :** কোনো ব্যক্তিই ভালো স্বাস্থ্য ব্যতীত অসাধারণ সাফল্য উপভোগ করতে পারে না। অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ। আর আছে, যেমন :

ক. অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ স্বাস্থ্যের প্রতি সহায়ক নয়

খ. চিন্তার ভুল অভ্যাস; ফলে নেতিবাচক ভঙ্গি প্রকাশ পায়

গ. যৌনতার প্রতি অতিরিক্ত প্রশ্রয় দান ও ভুল প্রয়োগ

ঘ. উপযুক্ত দৈহিক ব্যায়ামের অভাব

ঙ. বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব, ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা

৬। **প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা শৈশবকাল :** 'একটি গাছ ঠিক ততটাই বেড়ে ওঠে, যতগুলো পাতার বোঝা এটা বহন করতে পারবে।' বেশিরভাগ লোকজন যারা অপরাধের প্রবণতাগুলো অর্জন করেছে, এগুলোর কারণ হচ্ছে, তাদের শৈশবের খারাপ পরিবেশ এবং অনুপযুক্ত সহযোগীদের জন্য। কথায় আছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ!'

৭। **দীর্ঘসূত্রতা :** দীর্ঘসূত্রতা মানে কাজ জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী করার প্রবণতা বা গড়িমসি করার অভ্যাস। আরেকটি শব্দ আছে দীর্ঘসূত্রিতা, এর মানে চিরক্রিয়তা বা বহুদিন ধরে কাজ করে যাওয়া। যাই হোক, দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে ব্যর্থতার সবচেয়ে সাধারণ কারণ। শতকরা ৯০% ব্যর্থ লোকের মধ্যে এই ব্যাপারটি পাওয়া যায় যে, সে সফল হতে পারতো যদি সে শুধু কাজটি করতো। অনেকেই বলে, 'আমি এই কাজ করলে ঠিকই সফল হতাম।' এটাই দীর্ঘসূত্রতা। সে এই কাজ জীবনেও করতে পারবে না।

দীর্ঘসূত্রতাকে তুলনা করা যায় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে। এই 'বৃদ্ধ ব্যক্তির দীর্ঘসূত্রতা' প্রত্যেক মানবসত্তার ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে একজনের সাফল্যের সম্ভাবনাগুলোকে নষ্ট করা যায়।

আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের জীবনই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে যায়। কারণ আমরা 'সময় ঠিক হওয়ার' অপেক্ষা করি। সময় হলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করবো, সময় হলে মূল্যবান কিছু শুরু করবো। আরে ভাই! এই সময়টা আসবে কখন? উত্তর হচ্ছে জীবনেও না। সময় আসে না। সময়কে আনতে হয়, তৈরি করতে হয়, নির্মাণ করতে হয়। অপেক্ষা করবেন না। সময় কখন আসবে তার জন্য বসে থাকবেন না। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকেই শুরু করুন, আর তোমার কাছে যা যন্ত্রপাতি আছে তাই নিয়ে কাজ করো। ...দেখবেন আরও যা যা দরকার, তা তুমি কাজ করতে করতে, সামনে এগিয়ে যেতে যেতে পেয়ে যাবে। একমাত্র তখনই দেখবে, সময় ঠিক হয়ে গেছে।

৮। **অধ্যবসায়ের অভাব :** আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ যে কোনো কাজের 'আরম্ভ' বেশ ভালোভাবেই করে, প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনায়, কিন্তু যেই না কিছুদূর আগায় সেই মুখ থুবড়ে পড়ে, 'শেষ' হয় দরিদ্রভাবে। অধিকন্তু, পরাজয়ের প্রথম যে চিহ্ন আমি দেখি সেটা হচ্ছে, লোকজনের ত্যাগ করার প্রবণতা, কাজ ছেড়ে দেওয়ার একটি তাড়া। এমন অবস্থায় অধ্যবসায়ের বিপরীতে প্রতিস্থাপন যোগ্য কিছু নেই। যে ব্যক্তির নীতি ও চরিত্র গঠিত হয় অধ্যবসায় দিয়ে, তার মধ্যে তুমি দেখবে 'এক জ্বলন্ত আগুন'। যেই আগুনের সাথে লড়াই করতে করতে দীর্ঘসূত্রতা, অলসতা ও ব্যর্ততাও অবশেষে কান্ত হয়ে যায়। এজন্যই ব্যর্থতা কখনো অধ্যবসায়ের সাথে পেরে উঠতে পারে না।

৯। **নেতিবাচক ব্যক্তিত্ব :** সেই ব্যক্তিটির প্রতি কোনো আশা নেই যে, একটি নেতিবাচক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে লোকজনকে হটিয়ে দেয়। সাফল্য আসে ক্ষমতার পদ্ধতি প্রয়োগ করার মাধ্যমে এবং ক্ষমতা অর্জন করা যায়, অন্যান্য লোহজনের সহযোগিতার মাধ্যমে। (ক্ষমতা কীভাবে অর্জন ও প্রয়োগ করতে হয়, তা সম্পর্কে ভেতরের প"ষ্ঠায় বলা হয়েছে।) একটি নেতিবাচক ব্যক্তিত্ব কখনো সহযোগিতা ঘটায় না।

১০। **যৌন উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণের অভাব :** যৌনশক্তি হচ্ছে সকল উত্তেজনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী, যা লোকজনকে কাজের দিকে চালিত করে। কারণ এটা হচ্ছে, সব আবেগের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী। এটা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, অন্যান্য মাধ্যমে যেমন, কর্মশক্তিতে রূপান্তর ও পরিবর্তিত হতে হবে।

এজন্যই পূর্বে আমাদের গ্রামে-গঞ্জে ছেলেরা কোনো কাজকর্ম না করলে, অলস বসে থাকলে তাদের বিয়ে দিয়ে দিতো। তারপর তারা বাধ্য হতো কাজ করতে।

কিন্তু এখন তাও হয় না। কারণ বিয়ে দিলেও, ছেলেদের কোনো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকার কারণে তাকে বাধ্য হয়ে কোনো রকম একটি কাজ বা চাকরি করে দিন অতিবাহিত করতে হয়। তুমি যাই করো না কেন, তুমি যদি তোমার জীবনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য না নেও, তবে তুমি ফুটবল মাঠে ফুটবল নিয়ে খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে দৌড়ে যাবে, কিন্তু গোল করার জন্য কোনো গোলপোস্ট পাবে না। এই অনন্ত দৌড় কোনোদিন শেষ হবে না। তবে তোমার পরিশ্রম হবে, তুমি অনেক কাজ করবে, কিন্তু জীবন শেষে দেখবেন স্কোরবোর্ড শূন্য।

১১। **'কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়ার চেষ্টা' এটার প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা :** তুমি কি কখনো জুয়া খেলেছো? 'কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়ার চেষ্টা' হচ্ছে জুয়া প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি বা মনোভাব লাভ কোটি লোকজনকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। তুমি একটু ইতিহাস ঘাটলেই এর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাবে। অথবা তুমি যদি ১৯২৯ সালের ওয়াল স্ট্রিট পতনটি নিয়ে একটু অধ্যয়ন করো, তবে দেখবে লাখ লাখ লোক, যারা শেয়ার বাজার সম্পর্কে কিছু জানেও না, তারা তাদের এই 'কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়ার চেষ্টা' বা জুয়াড়ি মনোভাব নিয়ে অর্থ আয়ের চেষ্টা করে। ফলাফল তো তুমি জানোই।

১২। **সিদ্ধান্তকে ঠিকভাবে বর্ণনার অভাব :** সফল ব্যক্তিরা দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌছায় এবং যদি দরকার হয় এগুলোকে খুব ধীরভাবে পরিবর্তন করে। তার মানে সহজে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে না। অন্যদিকে ব্যর্থ ব্যক্তিরা খুব ধীরভাবে সিদ্ধান্তে পৌছায় এবং যদি দরকার হয় এগুলোকে খুব দ্রুতভাবে পরিবর্তন করে। আর তারা এটা প্রায়ই করে। সিদ্ধান্তহীনতা ও দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে যমজ ভাই। যেখানে একজনকে পাওয়া যায়, অন্যটিকে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পাওয়া যায়। এই জোড়াকে আগেই মেরে ফেলো; নতুবা তারা আপনাকে ব্যর্থতার যাতাকলে পিষে শেষ করে ফেলবে।

১৩। **ছয়টি মূল ভীতির একটি বা অধিক ভীতির উপস্থিতি :** তোমার জন্য এই ভীতিগুলোকে পরবর্তী একটি অধ্যায়ের মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলোর ওপর অবশ্যই কর্তৃত্ব করতে হবে। তোমার দক্ষতা ও যোগ্যতা বাজারজাত করার আগেই এই ভীতিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করতে হবে।

১৪। **বিবাহে ভুল সঙ্গী চয়ন :** এটা বৈবাহিক সম্পর্ক মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে। যদি-না এই সম্পর্ক সমসুর চেতনায় বিরাজ করে, ব্যর্থতা স্বাভাবিকভাবেই অনুরসণ করবে। তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে, এটা এমন এক আকারের ব্যর্থতা গঠন করবে, যা দুর্দশা ও সুখহীনতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। এই ব্যর্থতা পুরোপুরি দ"শ্যমান। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপারটি হচ্ছে, ভুল সঙ্গী চয়ন

করলে ব্যক্তির মধ্যকার সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয়ে যায়। এটা কেবল পুরুষের জন্য নয়, নারীর জন্যও সমানভাবে সত্য।

১৫। **অতি-সতর্কতা :** যে ব্যক্তি কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, সাধারণত তাকে অন্যান্যরা যা কিছু ফেলে গেছে তাই নিতে হয়। অতি-সতর্কতা ততটাই খারাপ যতটা অল্প-সতর্কতা। উভয়ের বিরুদ্ধেই চরমভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের জীবন অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো নিয়ে পূর্ণ। আমরা ঝুঁকি নেই বা না নেই, যে কোনো সময় আমাদের সাথে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। এই চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া ভালো।

১৬। **ব্যবসায় ভুল সহযোগী চয়ন :** ব্যবসায় ব্যর্থতার কারণগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় কারণ। আপনি যদি আপনার দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে চাকরি করতে যাও, তাহলেও এই বিষয়ে সতর্ক থাকবে। তোমার মালিক বা নিয়োগকর্তা কেমন সে সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। এমন একজন নিয়োগকর্তা চয়ন করতে হবে, যিনি হবে অনুপ্রেরণাদায়ী এবং যিনি স্বয়ং বুদ্ধিমান ও সফল। যাদের আমরা ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগী, আমরা তাদেরই সমকক্ষ হতে চেষ্টা করি। এমন একজন নিয়োগকর্তা তুলে নান যার সমকক্ষ হওয়াটা মূল্য রাখে।

১৭। **কুসংস্কার ও পূর্বসংস্কার :** কুসংস্কার হচ্ছে, ভীতির ফলে গঠিত হওয়া একটি রোগ। তাছাড়া এটা হচ্ছে অজ্ঞতারও একটি চিহ্ন। যেসব ব্যক্তিরা সফল হয়, তাদের মনগুলোকে তারা খোলা রাখে এবং কিছুকেই ভয় পায় না।

১৮। **ভুল পেশা চয়ন :** কোনো ব্যক্তিই যদি এমন কোনো কাজ করে বা চেষ্টা করে, যা সে পছন্দ করে না, তবে সে কোনোদিনই সেই পেশায় সফল হতে পারে না। এমন কাজ করা ব্যক্তির আত্মা ও হৃদয় কখনো তৃপ্ত হবে না। ব্যক্তিগত সেবাগুলোকে বাজারজাত করতে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ধাপ হচ্ছে, এমন একটি পেশা চয়ন করা, যাতে তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ছুঁড়ে দিতে পারেন।

১৯। **নিজের চেষ্টার প্রতি মনোযোগের অভাব :** একজন 'সবজান্তা' ব্যক্তি কদাচিৎ কোনো কিছুতে দক্ষ হয়। আপনার সকল চেষ্টাকে মাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত করুন।

২০। **এলোমেলো খরচের প্রতি অভ্যাস :** একজন অমিতব্যয়ী ব্যক্তি কখনো সফল হতে পারে না। প্রধান কারণ হচ্ছে, তিনি সম্পূর্ণভাবে দরিদ্র ভীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। একটি পদ্ধতিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে অভ্যাস গঠন করুন। তোমার আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাশে সরিয়ে রাখার মাধ্যমে সঞ্চয়ের অভ্যাস গঠন করো। ব্যাংকের সঞ্চিত অর্থ একজনকে একটি নিরাপদ ভিত্তি দেয়, যাতে ভালো

চাকরি খুঁজে পাওয়া যায় এবং দর কষাকষি করা যায়। (যেমন আমার এক বন্ধুর কাছে ৪০,০০০ টাকা সঞ্চয় ছিল। সে তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আরও কিছু দক্ষতা অর্জন করেছে এবং পূর্বে থেকে ভালো একটি চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দিচ্ছে। তার সঞ্চয় তাকে চাকরি ছাড়া অন্ততপক্ষে ছয়মাস চলার খরচ জুগিয়েছে। তাই সে নির্বিঘ্নে তার কাজে মন দিতে পারছে।) অর্থ ব্যতীত, একজনকে অবশ্যই তাই নিতে হবে, যা একজন প্রস্তাব দেয়। আর এটা পেয়েই খুশি থাকতে হবে।

২১। **গভীর আগ্রহের অভাব :** আগ্রহ আছে, তবে এই কোনোরকম আর কি। এমনটি হলে চলবে না। গভীর আগ্রহ ব্যতীত তুমি অন্যের মধ্যে তোমাকে বিশ্বাসকে পৌছে দিতে পারবেন না। অধিকন্তু, গভীর আগ্রহ হচ্ছে সংক্রামক বা ছোঁয়াচে ব্যাপার। যেমন : হাসি। হাসি, একটি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে ব্যাপার। আমরা কাউকে প্রাণখুলে হাসতে দেখলে আমাদেরও হাসি পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো শিশুর হাসি দেখলে এটা ঘটে। আপার আগ্রহটিও ঠিক এমনই হতে হবে। যে ব্যক্তির গাঢ় আগ্রহ রয়েছে এবং এটা তার নিয়ন্ত্রেণে রয়েছে, সে যে কোনো গোষ্ঠীর মানুষের কাছেই স্বাগত।

২২। **অধৈর্য :** যে ব্যক্তি একটি 'বদ্ধ' মন নিয়ে থাকে সে কদাচিৎ উন্নতি করে। অধৈর্য মানে যে একজন ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করা বন্ধ করে দিয়েছে। অধৈর্যের সর্বাধিক ক্ষতিকর উদাহরণ হচ্ছে ধর্ম নিয়ে অসহিষ্ণুতা, জাতিগত বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক ভিন্ন মতামতকে অশ্রদ্ধা করা।

২৩। **অসংযম :** সর্বাধিক ক্ষতিকর অসংযমের আকারগুলো হচ্ছে, এগুলোর সাথে জড়িত থাকা, যেমন : অতিরিক্ত খাবার, সুরাপান ও যৌন কর্মগুলোর সাথে জড়িত থাকা। এগুলোর যে কোনটির প্রতি অত্যধিক প্রশ্রয় দান করা সাফল্যের প্রতি মারাত্মক।

২৪। **অন্যদের সাথে সহযোগিতার প্রতি অক্ষমতা :** অনেক লোকজন তাদের জীবনে ঠিক পথ ও বড় বড় সুযোগ হারায়। কারণ অন্যদের সাথে সহযোগিতার প্রতি অক্ষমতা। এই ভুল থেকেই থেকেই অন্য ভুলগুলো আরম্ভ হয়। এটা হচ্ছে একটি ভুল যা কোনো ভালো-পরিচিত ব্যবসায়ী ব্যক্তি বা নেতা সহ্য করবে না।

২৫। **এমন ক্ষমতা যা নিজের চেষ্টায় অর্জিত নয় :** ধনী ব্যক্তিদের পুত্র, কন্যা ও অন্য যারা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থ পেয়েছে, যা তারা তাদের স্বীয় চেষ্টায় আয় করেনি, তাদের ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যার স্বীয় চেষ্টা দ্বারা ধীরে ধীরে ক্ষমতা অর্জন হয়নি, যে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পেয়েছে, প্রায়ই দেখা যায় সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এটা সাফল্যের প্রতি মারাত্মক তিকর। হঠাৎ করে যারা ধনী হয়

তারা দরিদ্রদের থেকেও ভয়ানক মানসিক রোগে আক্রান্ত।

২৬। **ইচ্ছাকৃত অসততা :** সততার বিপরীতে প্রতিস্থাপন যোগ্য কোনো কিছু নেই। একজন হয়তো পরিস্থিতির চাপে পড়ে সাময়িকভাবে অসৎ হতে পারে। কারণ অনেক সময়ই দেখা যায়, পরিস্থিতির ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু যে ইচ্ছাকৃতভাবে অসৎ তার জন্য কোনো আশা নেই। কাছে বা দূরে, তার কাজের জন্য তাকে ধরা দিতেই হবে। সে সম্মান হারাবে। হয়তো তার স্বাধীনতাও হারাতে পারে। এভাবেই সে তার কৃতকর্মের দাম পরিশোধ করবে।

২৭। **আমিত্ব ও অহংকার :** এই গুণগুলো এমন সেবা দেয়, যেন লাল বাতি যা অন্যদের সতর্ক করে যেন 'দূরে থাকুন'। এগুলো সাফল্যের প্রতি মারাত্মক ক্ষতিকর।

২৮। **চিন্তা করার পরিবর্তে অনুমান করা :** বেশিরভাগ লোকজন পর্যাপ্ত তথ্য নিয়ে, বসে বিশ্লেষণ করে, পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ করতে খুবই অনাগ্রহী বা অলস। এর পরিবর্তে তারা অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করতে চায়। তারা অনুমান ভিত্তিক কাজ করতে পছন্দ করে বা হঠাৎ কোনো কাজের কথা মনে পড়লো, 'চলো এটা করে ফেলি', আর কাজটি করে ফেললো। তারপর আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পেলে বলে, 'আমার ভাগ্যে ছিল না।' অথচ সে যদি পূর্বে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করতো, তবে সে সহজেই দেখতে পেতে যে এই পদ্ধতিতে কাজ করলে ব্যর্থতা নিশ্চিত।

২৯। **পুঁজির অভাব :** এটা একটি সাধারণ কারণ। যারা প্রথম ব্যবসা শুরু করে তাদের মধ্যেই এটা বেশি দেখা যায়। পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকলে ব্যবসায় তোমার যে ক্ষতি হবে, ভুল হবে সেগুলো সংশোধন করে পুনরায় ব্যবসায় নামতে পারবে না। একমাত্র ব্যর্থ হয়ে, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুনরায় নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামলেই কেবল খ্যাতি পেতে পারেন।

৩০। **এটার নিচে, যে কোনো বিশেষ ব্যর্থতার কারণ এর নাম লিখুন :** যাতে আপনি ভুগছেন। যে নাম আমাদের উপরে উল্লেখিত তালিকায় যুক্ত করা হয়নি। আপনি যে কোনো ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গেলে প্রধানত এই ত্রিশটি কারণ খুঁজে পাবেন।

এটা জীবনের এক দুঃখময় ঘটনার বিবৃতি। এই অভিজ্ঞতা তারাই লাভ করে যারা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এটা সহায়ক হবে যদি তুমি কারও সাহায্য নেন, যিনি আপনাকে উত্তমভাবে জানেন, যাতে তিনি আপনার সাথে তালিকাটির মধ্য দিয়ে যাবে এবং ত্রিশটি ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে তোমাকে সহায়তা করবে। অথবা তুমি যদি একা একাই চেষ্টা করো, তবে আরও বেশি লাভবান হবে। বেশিরভাগ লোকজন

নিজেদের দেখতে পায় না, যেমন অন্যরা তাদের দেখে। তুমি হয়তো সেই একজন, যে নিজেকে দেখতে পায় না।

সতর্কীকরণগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পুরাতন হচ্ছে, 'মানুষ, নিজেকে জানো!' যদি তুমি নিজেকে বা নিজের পণ্যকে সফলভাবে বাজারজাত করতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই নিজের সম্বন্ধে বা নিজের পণ্যটি সম্বন্ধে জানতে হবে। এই সত্য সব ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তোমাকে তোমার সব ধরনের দুর্বলতা সম্বন্ধে জানতে হবে, যাতে তুমি সেগুলোর ওপর সেতু নির্মাণ করতে পারো, অথবা সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করতে পারো। তোমাকে জানতে হবে, তোমার সব শক্তি সম্বন্ধে যাতে তুমি সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে পারো। এতে করে তুমি তোমার চাকরিতে বা ব্যবসাতে নিজের শক্তিগুলোকে প্রয়োগ করতে পারবে। তুমি নিজেকে জানতে পারবে কেবল যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আর এই বিশ্লেষণ কীভাবে করবেন? সামনে পড়ে যাও। সামনেই কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, যা তোমাকে সহায়তা করবে।

এখন এক যুবক সম্পর্কে বলি। সে একটি পদে চাকরির জন্য একটি কোম্পানিতে আবেদন করে। তাকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। তো ব্যবস্থাপকের সাথে বেশ ভালোই আলাপ হলো। শেষে ব্যবস্থাপক তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কতো বেতন আশা করছো?' জবাবে সে বললো, আমি তো তেমন কোনো সংখ্যা স্থির করি নাই। এটা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব। তারপর ব্যবস্থাপকটি বললো, 'আমরা তোমাকে ঠিক ততটুকুই বেতন দিবো, যতটুকুর তুমি যোগ্য। তবে আমার এখানে আগে এক সপ্তাহের জন্য কাজ করে দেখাতে হবে।'

আবেদনকারী এবার চটে গেল, 'অসম্ভব! আমি এখন যেখানে কাজ করি, সেখানে আমি বেশ ভালো বেতন পাই। আর আপনার এখানে পরীক্ষামূলক কাজ করার পর যদি আমি নির্বাচিত না হই, তবে তো আমি পূর্বের চাকরিটিও হারাবো।'

এজন্য আগেই চিন্তা করুন। বেতনের ব্যাপারটিও আগেই বলুন। নিজে যোগ্যতাকে ঠিক মাপকাঠিতে মেপে নিন। তারপর অন্য কোথাও যাওয়ার চিন্তা করুন। যে কোনো চাকরি খোঁজার আগে দেখে নাও। হয়তো তুমি এখন যেখানে আছো সেখানেই তুমি যথার্থ মূল্য পাচ্ছো।

একটি জিনিস চাওয়া, আর সেটিকে নির্দিষ্টভাবে চাওয়ার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। সবাই অর্থ চায়। কিন্তু কতো চায়? একজন মানুষ কতো টাকা চায়? এটা যদি নির্দিষ্ট করে, তবেই সে তার নির্দিষ্ট আকাক্ষার জন্য নিজের পুরো মনোযোগ দিতে পারবে এবং নিত্যনতুন দক্ষতা ও যোগ্য অর্জন করে, সেই অর্থ পাওয়ার চেষ্টা করবে।

আবার অনেকে বেতনের টাকার ওপর ভিত্তি করে তাদের চাওয়া নির্ধারণ করে। এটা ভুল। তোমার যোগ্যতা তোমার চাকরির বেতনের চেয়ে অনেক বেশি। আর দক্ষতা, যোগ্যতা ও সম্ভবনা কখনো তোমার বেতনের টাকায় পরিমাপ করা যাবে না এবং যায়ও না। তোমার মূল্য তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন তুমি তোমার দক্ষতা ও যোগ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাবে। এজন্য তোমার অবশ্যই আত্মকে জানতে হবে, নিজেকে চিনতে হবে। আর আপনার মধ্যে যদি নেতৃত্বের গুণাবলি থাকে, তুমি যদি অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে সক্ষম একজন ব্যক্তি না, তবে তুমি নিশ্চয়ই তোমার সহকর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে। এজন্য তোমাকে অবশ্যই নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করতে হবে, চিনতে হবে ও নিজেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তোমাকে সহায়তা করতে নিচে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো, যা তোমার আত্ম-উন্মোচনে সহায়তা করবে।

নিজেকে উদ্ভাবন করো
নিজেকে জানতে ২৮টি প্রশ্ন

নিজেকে জানো! নিজেকে জানতে হলে প্রথমে নিজের আত্ম-বিশ্লেষণ করো। এজন্য প্রতি বছর অন্তত একবার নিজের আত্ম-বিশ্লেষণ করতে পারো। এটা অনেকটা বাৎসরিক হালখাতার মতো। হালখাতার দিন যেমন পুরো বছরের হিসাব-নিকাশ করা হয়, কোথায় কতো মুনাফা হয়েছে, কোথায় কতো ঘাটতি ঘটেছে তা বশ্লেষণ করা হয়, তেমনি তুমি বছরে একদিন নিজেকে সময় দাও, নিজেকে বিশ্লেষণ করো, যাতে তোমার গুণাবলি চিনতে পারো এবং এগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে পারো। আর নিজের দোষগুলোও জানতে পারো, যাতে এগুলোকে দূর করতে পারো। যে ডাক্তার রোগীর রোগ ধরতে পারে না, সে ঠিক ঔষধও দিতে পারে না। নিজেকে একজন চিকিৎসকের মতো খুঁটেখুটে, অতি যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করো।

একটি ব্যবসায় যেমন তিনটি পরিস্থিতি ঘটে : হয় ব্যবসা সামনে এগিয়ে যায়; না-হয় ব্যবসা স্থির হয়ে থাকে, অথবা ক্ষতি হয় বা ঋণাত্মক দিকে যেতে থাকে। তেমনি মানুষের জীবনেও এই তিনটি ধাপ রয়েছে : একজন হয় সামনে এগিয়ে যায়, স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, অথবা জীবনে পিছনে ফিরে যায়। সামনে এগিয়ে যাওয়াটাই একজনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বাৎসরিক আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নতি হয়েছে কিনা জানা যায় এবং যদি হয়, কতোটুকু হয়েছে তাও নিশ্চিত হওয়া যায়। এতে করে একজন পিছনের দিকে যাচ্ছে কিনা সেটাও বোঝা যায়। তুমি যদি নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি খোঁজো, তবে তোমাকে অবশ্যই সামনে এগিয়ে যাওয়া

উচিত। যদি তোমার অগ্রগতি ধীরও হয় তবুও এগিয়ে যেতে হবে।

তোমার বাৎসরিক আত্ম-বিশ্লেষণ তৈরি হওয়া উচিত প্রত্যেক বছরের শেষের দিকে। যাতে তুমি আপনার নতুন বছরের সংকল্পগুলোতে যে কোনো সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করতে পারো, যে কোনো দরকারি কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে পারো। নিচের প্রশ্নগুলো নিজেকে জিজ্ঞেস করো এবং নিজেকে উদ্ভাবন করো। তুমি ইচ্ছা করলে অন্য কারও সহযোগিতা নিতে পারো। এমন কারও সহযোগিতা নাও, যে তোমার সাথে প্রতারণা করবে না। একদম ঠিক যা তুমি আছো, ঠিক তাই তোমাকে বলবে।

নিজেকে উদ্ভাবন করো
আত্ম-বিশ্লেষণের প্রশ্নাবলি

০১. আমি এই বছরের শুরুতে যে লক্ষ্যটি অর্জন করবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি কি তা অর্জনে চেষ্টা করেছি? (আপনার জীবনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। আপনি সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য এই বছর কীভাবে কাজ করেছেন?)

০২. বাৎসরিক লক্ষ্য পূরণে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি কি তার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি? অথবা আমি যদি চেষ্টা করেই থাকি, তবে এই গুণমান আর কীভাবে উন্নত করা যায়? এই কাজ করতে গিয়ে আমি কি আমার কোনো দক্ষতা, যোগ্যতা বা গুণে অগ্রগতি সাধন করেছি?

০৩. আমি কি আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু চেষ্টা করেছি। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি?

(২নং হচ্ছে : আপনার চেষ্টার গুণমান কেমন ছিল? কেবল চেষ্টা করলেই হবে না, ভালো মানের চেষ্টা করতে হবে, উত্তমভাবে চেষ্টা করতে হবে। আর ৩নং হচ্ছে : চেষ্টার পরিমাণ কেমন ছিল? আপনি কতোটুকু চেষ্টা করেছেন?
আপনার চেষ্টার তীব্র কতোটুকু ছিল?)

০৪. আমার আচরণ কি সবসময় সহযোগিতাপূর্ণ ছিল?

০৫. আমি কি আমার কার্যকারিতা হ্রাস করতে গড়িমসির অভ্যাসটিকে অনুমতি দিয়েছিলাম? যদি তাই, তবে কেন ক্ষেত্রে?

০৬. আমি কি আমার ব্যক্তিত্বে অগ্রগতি তৈরি করেছি এবং যদি করে থাকি, তবে কোন পথে?

০৭. আমি কি আমার পরিকল্পনা অনুসরণে অধ্যবসায়ী ছিলাম?

০৮. আমি কি সব পরিস্থিতিতে দ্রুত ও নির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

০৯. আমি কি ছয়টি মূল ভীতির যে কোনো একটি বা একাধিক ভীতিকে আমার কার্যকারিতা হ্রাস করতে অনুমতি দিয়েছিলাম?
১০. আমি কি 'অতি-সতর্ক' ছিলাম; নাকি 'কম-সতর্ক ছিলাম?
১১.আমার সহযোগীদের সাথে আমার সম্বন্ধ কি সন্তোষজনক; নাকি অসন্তোষজনক? যদি এটা অসন্তোষজক হয়, তবে ভুলটি কি আংশিকভাবে আমার; নাকি সম্পূর্ণভাবে আমার?
১২. আমি কি আমার চেষ্টার প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রভূত না করে আমার শক্তির অপচয় করছি?
১৩. আমি কি লোকজনের সাথে যোগাযোগকালে মন খুলে কথা শুনেছি? আমি কি আলাপকালে ধৈর্যশীল ছিলাম?
১৪. আমি আমার দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কোন পথে বৃদ্ধি করেছি বা কোন কোন দিকে উন্নত করেছি?
১৫. আমার কোন অভ্যাসগুলোর প্রতি আমি অধৈর্য ছিলাম?
১৬. আমি কি কোনো ধরনের আমিত্ব বা অহংকার প্রকাশ করেছিলাম? খোলাভাবে বা গোপনভাবে?
১৭. আমার আচরণ কি আমার সহযোগীদের প্রতি এমন ছিল যে, আমাকে সম্মান করার প্রতি এটা তাদের প্রবৃত্ত করেছে?
১৮. আমার মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি কি অনুমানের ওপর; নাকি যথার্থ বিশ্লেষণ ও চিন্তার ওপর?
১৯. আমি কি আমার আয়, ব্যয়ও সময় হিসাব করে খরচ করেছি? আমি কি মিতব্যয়িতার এই অভ্যাস গঠন করেছি? আমি কি উদ্দেশ্যবশত কম খরচ করেছি?
২০. আমি আমার কতো সময় অলাভজনক চেষ্টায় উৎসর্গ করেছি, যা আমি হয়তো আমার উত্তম সুবিধার প্রতি প্রয়োগ করতে পারতাম?
২১. আমি কীভাবে আমার সময়ও অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে পারি, যাতে আমি আগামী বছরে আরও কার্যকরী হতে পারি?
২২. আমি কি এমন কোনো আচরণ করেছি, যাতে আমার বিবেক আমাকে অনুমতি দেয়নি?
২৩. আমি এখন যা বেতন পাই তারচেয়ে আমি আর কোন পথে আরও বেশি সেবা ও উত্তম সেবা সম্পন্ন করতে পারি?
২৪. আমি কি কারও প্রতি অন্যায় করেছি এবং যদি করে থাকি তবে কোন পথে অন্যায় করেছি?

২৫. যদি আমি আমার নিজের সেবাগুলোর ক্রয়কারী হতাম তবে কি আমি আমার ক্রয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হতাম?
২৬. আমি কি ঠিক পেশায় আছি এবং যদি না থাকি, তবে কেন নয়?
২৭. আমার সেবাগুলোর ক্রয়কারী কি সন্তুষ্ট হয়েছে যে, সেবা আমি সম্পন্ন করেছি এবং যদি না হয়, তবে কেন নয়?
২৮. সাফল্যের মৌলিক সূত্রগুলোতে আমার বর্তমান পর্যায় কতো? (এই পর্যায় তৈরি করুন ন্যায্যভাবে ও সাহসীভাবে এবং এটাকে যথেষ্ট সাহসী একজনকে দিয়ে পরীক্ষা করুন।)

এই অধ্যায়টি ধীরে ধীরে পাঠ করুন এবং তথ্যটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করুন। যে অর্থ এই অধ্যায় বহন করে তা বুঝো। তারপর তুমি তোমার দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে চাকরি পেতে একটি বাস্তবিক পরিকল্পনা তৈরি করো।

সুপ্রাচীন যদি দ্বারা মোড়ানো 'সাতান্নটি' বিখ্যাত অজুহাত

যেসব লোকজন সফল হয় না, তাদের সবার মাঝে একটি সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। তারা সবাই ব্যর্থতার সব ধরনের কারণ জানে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের অজুহাতগুলোই হচ্ছে তাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। তারা প্রতিনিয়ত তাদের জীবনে সফল হতে না পারার কারণ হিসেবে তাদের অজুহাতগুলোকে কৈফিয়ত রূপে ব্যবহার করে থাকে।

হয়তো এগুলোর মধ্যে অল্প কিছু কারণ সমর্থন করা যায়। হয়তো কিছু লোকজন এমন আচরণ করে চালাকি দেখাতে চায়। কিন্তু আপনি কখনো অজুহাত দিয়ে টাকা আয় করতে পারবে না। বিশ্ব কেবল একটি জিনিসই জানতে চায়, আর তা হচ্ছে, 'তুমি কি সফল হয়েছো?

একজন চরিত্র বিশ্লেষক অজুহাতের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। এই তালিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অজুহাতগুলো দেখানো হয়েছে। তালিকাটি যখন পাঠ করবে, তখন নিজেকে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করো। যদি তোমার মধ্যে এই অজুহাতগুলোর কোনোটি থাকে, তবে তা খুঁজে বের করো। আর মনে রাখবেন এই বইয়ে প্রকাশিত দর্শনটি এই সবগুলো অজুহাতকে বাতিল করে দিয়েছে।

যদি আমার বউ ও পরিবার না থাকতো...
যদি আমার ওপর যথেষ্ট 'চাপ' থাকতো...
যদি আমার টাকা-পয়সা থাকতো...
যদি আমার পড়ালেখা থাকতো...

যদি আমি একটি চাকরি পেতাম...
যদি আমার স্বাস্থ্য ভালো থাকতো...
যদি আমার সময় থাকতো...
যদি সময়টা আরও ভালো হতো...
যদি লোকজন আমাকে বুঝতো...
যদি আমার পরিবেশ ভিন্ন হত...
যদি আমি আমার জীবন পুনরায় যাপন করতে পারতাম...
যদি আমি 'লোকজন' কী বলবে, তাতে ভয় না পেতাম...
যদি আমাকে একটি সুযোগ দেওয়া হতো...
যদি আমি এখন একটি সুযোগ পেতাম...
যদি আমার জন্য অন্য লোকজন 'এটা না নিতো'...
যদি আমাকে থামাতে কিছুই না ঘটতো...
যদি আমি তরুণ হতাম...
যদি আমি যা চাই তাই করতে পারতাম...
যদি আমি ধনী ঘরে জন্মাতাম...
যদি আমি ঠিক লোকের সাক্ষাৎ পেতাম...
যদি আমার অন্যদের মতো মেধা থাকতো...
যদি আমি নিজের সম্পর্কে আরও সাহসী হতাম...
যদি আমি অতীত সুযোগগুলোকে আলিঙ্গন করতাম...
যদি লোকজন আমাকে এতো উত্যক্ত না করতো...
যদি আমাকে ঘর সামলাতে এবং শিশুদের যত্ন নিতে না হতো...
যদি আমি কিছু টাকা জমা করতে পারতাম...
যদি আমার মালিক আমাকে একবার উৎসাহ দিতো...
যদি আমি এমন কাউকে পেতাম, যে আমাকে সহায়তা করবে...
যদি আমার পরিবার আমাকে বুঝতো...
যদি আমি একটি বড় শহরে বাস করতাম...
যদি আমি এখনই আরম্ভ করতে পারতাম...
যদি আমি মুক্ত হতাম...
যদি আমার অন্যদের মতো ব্যক্তিত্ব থাকতো...
যদি আমি এত মোটা না হতাম...
যদি আমার মেধার কথা সবাই জানতো...
যদি আমি এখন 'আরম্ভ করার সুযোগ' পেতাম...

যদি আমি ঋণ থেকে বের হতে পারতাম...
যদি আমি ব্যর্থ না হতাম...
যদি আমি শুধুমাত্র জানতাম কীভাবে...
যদি সবাই আমার বিরুদ্ধে না থাকতো...
যদি আমি এতো পরিমাণ উদ্বিগ্ন না হতাম...
যদি আমি ঠিক পুরুষকে বিয়ে করতাম...
অথবা যদি আমি ঠিক নারীকে বিয়ে করতাম...
যদি লোকজন এতো বেক্কেল না হতো...
যদি আমার পরিবার এতো অপচয়ী না হতো...
যদি আমি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতাম...
যদি ভাগ্য আমার বিরুদ্ধে না থাকতো...
যদি আমার রাশি ভালো হতো...
যদি এটা সত্য না হতো যে, সবকিছু আগে থেকেই ঠিক করা...
যদি আমাকে এতো কঠিন কাজ করতে না হতো...
যদি আমি আমার অর্থ-কড়ি না হারাতাম....
যদি আমি একটি ভিন্ন পরিবেশে থাকতাম...
যদি আমার একটি 'অতীত' না থাকতো...
যদি আমার একটি নিজস্ব ব্যবসা থাকতো...
যদি লোকজন আমার কথা শুনতো?

যদি....এবং সবগুলোর মধ্যে এই শূন্যস্থানই (....) হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক। এখানে তোমার পছন্দমতো অন্য কোনো অজুহাত বসাতে পারো।

নিজেকে বলো, আমি নিজের সম্পর্কে জানার ও নিজেকে খুঁজে দেখার সাহস দেখিয়েছি। আমি যেমন আমি তেমনি নিজেকে খুঁজে বের করবো। আমার ভুল কোথায় আমি জানবো। তারপর তা সংশোধন করবো। এরপর আমি হয়ত আমার ভুল ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি নতুন সুযোগ পাবো, যা কাজে লাগিয়ে আমি সফল হবো। আমি জানি আমার কিছু ভুল আছে; না হলে আমি আজকে সেই জায়গায় থাকতাম, যেখানে আমার থাকার কথা। যদি আমি আমার দুর্বলতাগুলো আগেই নিরীক্ষা করতাম এবং সেগুলোকে ঢাকার জন্য অজুহাত না দিতাম, তবে আমিও আজ সাফল্যের শিখরে থাকতাম। তাই আমি পূর্বে যে ভুল করেছি, তা আজকে করবো না। আমি নিজের আত্মবিশ্লেষণ করে নিজেকে সাফল্যের পথে ধাবিত করবো।

* সূত্র : থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ, নেপোলিয়ন হিল, মুক্তদেশ প্রকাশন।

আশা জাগিয়ে রাখো!
তাহলে পাহাড় নাড়িয়ে দিতে পারবে

বহু বছর আগে রেভারেণ্ড জেসি জ্যাকসন ইউএস ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করেন, যা কনভেনশনে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনি শুধু তিনটি শব্দ উচ্চারণ করেন, 'আশা জাগিয়ে রাখো! আশা জাগিয়ে রাখো!'

তিনি বারবার এ কথাগুলোই বলছিলেন। দর্শক ফেটে পড়েছিল হাততালিতে। তিনি আশা জাগিয়ে তুলেছিলেন।

আমিও এ কারণে বইটি লিখেছি... তোমাদের আশা জাগিয়ে দিতে! যে আশা দিয়ে তুমি বদলাতে পারো, ছুড়ে ফেলে দিতে পারো নেশা, জোরদার করতে পারো সম্পর্ক। এ আশা তোমাকে তোমার সমস্যার জবাব খুঁজে দিতে পারে এবং পৌঁছে দিতে পারে তোমার সর্বোচ্চ সম্ভাবনায়।

এ বইটি পড়ার পরেও যদি তুমি বিহ্বল বোধ করো, কীভাবে শুরু করবে ক্লু খুঁজে না পাও, তাহলে একটা কাজ করো: প্রতিটি অধ্যায়ের মূল আইডিয়াগুলোয় দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে যাও অথবা নিজেকে প্রশ্ন করতে পারো, 'কোন্ অভ্যাসটি আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হচ্ছে?' তারপর দুটি বা তিনটি বিষয় নিয়ে কাজে লেগে যাও। ওগুলো কাগজে লিখে নিয়ে এমন জায়গায় রাখবে, যাতে সহজেই চোখে পড়ে এবং প্রায়ই রিনিউ করতে পারো। তারপর ওগুলো পাঠ করে অনুপ্রেরণা লাভের চেষ্টা করো।

ছোট ছোট যেসব পরিবর্তন তোমার মধ্যে আসবে, তা তোমাকে বিস্মিত করে তুলবে। ক্রমান্বয়ে তোমার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে আত্মবিশ্বাস, নিজেকে সুখি মনে হতে থাকবে, তোমার লক্ষ্য পরিণত হবে বাস্তবে, তোমার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে, মনে আসবে শান্তি। সবকিছুর শুরু হবে একটিমাত্র পদক্ষেপের মাধ্যমে।

কোনো অভ্যাস বা আইডিয়া যদি সত্যি তোমার মনে ধরে যায়, তাহলে তা স্মৃতিতে তাজা থাকতে থাকতে অন্য কাউকে শিখিয়ে দাও।

যদি দেখো তুমি পেরে উঠছো না, হতাশ হয়ো না। বিমানের ফ্লাইটের কথা চিন্তা করো। প্লেন আকাশে ওঠার পরে এটির একটি ফ্লাইট প্ল্যান থাকে। ফ্লাইটের গমন পথে ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাত, এয়ারট্রাফিকসহ আরও নানান কিসিমের ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। বিমান তার যাত্রাপথে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে কোর্স থেকে সরে যায়। পাইলটের কাজ ইন্সট্রুমেন্ট দেখে ছোট ছোট কোর্সগুলোর কারেকশন করা এবং কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলা। এর ফলে প্লেন তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

তুমি তোমার ফ্লাইট প্ল্যান থেকে ছিটকে পড়ে গেছো, যদি মনে হয়, তাহলে কিছু আসবে যাবে না। শুধু যদি নিজের পরিকল্পনায় অটল থাকতে পারো, ছোট ছোট অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করে নিতে পারো এবং জাগিয়ে রাখতে পারো আশা, তুমি অবশেষে তোমার গন্তব্যে অবশ্যই পৌঁছাতে পারবে।

বইটি এখানেই শেষ। আমার সঙ্গে ভ্রমণের জন্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। শুধু এটুকু বলবো তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে আমি আশাবাদী। তোমাদের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে রয়েছে ভালো কিছু করার জন্য। সবসময় মনে রেখো, সফল হওয়ার মতো সবকিছু নিয়েই তোমরা জন্মেছো। অন্য কোথাও তাকাবার প্রয়োজন নেই তোমাদের। শক্তি এবং আলো তোমাদের মধ্যেই রয়েছে! তোমাদের মঙ্গল কামনায়। শন কোভি।





শন কোভি জন্ম বেলফাস্টে, বেড়ে ওঠা উটাহ রাজ্যে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, বোস্টন এবং ডালাসে থেকেছেন। বর্তমানে প্রভাব্ধ ইনোভেশন অ্যাট ফ্রাংকলিন কোভির ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি বার্মিংহাম ইয়ং ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন, ইংরেজিতে নিয়েছেন ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং পরে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ করেন।

তিনি ইনটতে কোয়ার্টারব্যাক হিসেবে খেলতেন এবং দুইবার ইএসপিএন-এর মোস্ট ভ্যালুয়েবল পেন্টয়ার-এর সম্মান অর্জন করেছেন। ফ্রাংকলিন কোভিতে যোগদানের আগে তিনি ডি-লয়েট এবং টাচ ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ট্রামেল ক্রো-ভেঞ্চারস এবং ওয়াল্ট ডিজনিতে কাজ করেছেন। তিনি কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে একজন জনপ্রিয় বক্তা হিসেবে পরিচিত। The 6 Most Important Decisions You'll Ever Make, The 4 Disciplines of Execution, The 7 Habits of Happy Kids- গ্রন্থেরও লেখক।

শন কোভি সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন, ধুলোমাখা তাঁর সাইকেলটি চালাতে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন পরিবারের সঙ্গে বাইরে ঘুরতে, খেতে যেতেন (তিনি প্রচুর খেতে পারতেন) এবং কবিতা লেখাও তাঁর পছন্দের বিষয়। শন কোভি এবং তাঁর স্ত্রী রেবেকা দুটি সন্তানের জনক-জননী। বাস করেন উটাহ'র রকি পর্বতমালায়।

চমৎকার! আমি এ পর্যন্ত যত বই পড়েছি তার মধ্যে সর্বসেরা বই হলো এটি। আমার কিশোর মস্তিষ্ককে মজবুত করেছে বইখানা। এটি সেরকম বই নয় যে, পড়া শেষ করে ছুড়ে ফেলে দিবেন। এটি সেই বই, যা বারবার পড়ার মতো এবং যতবার বইটি পড়বেন, ততবার মনে হবে, শেষেরবার কী যেন মিস করে গেছেন। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ-এ বইটি আপনাকে সাহায্য করবে। আর তাদের ও আপনার ভুলগুলো দেখাবে ভিন্ন চোখে।'

—হেরিফোর্ডের জনৈক পাঠক, বয়স ১৪

আমি বইটি কিনেছিলাম আমার মেয়ের জন্য, এখন এটি তার সবচেয়ে প্রিয় বইতে পরিণত হয়েছে এবং সে তার বন্ধুদেরকেও পড়ে শোনাচ্ছে।

—ওয়ার উইকশায়ারের জনৈক পাঠক

আমাকে মুগ্ধ করেছে বইখানা। মনে হয়েছে যেসব দরজা এতোদিন আমার কাছে বন্ধ ছিল তা যেন এক নিমেষেই ভেঙে গেল, খুলে গেল... অসাধারণ একখানা গ্রন্থ।

—পিটারসের জনৈক পাঠক, বয়স ১৫

অসামান্য! একজন শিক্ষক হিসেবে বলবো, একটি দুর্দান্ত বই। বইটি শিক্ষক কিংবা টিনেজার যে কারও জন্য ক্রয় করা যায়। আমি বইটি আমার ক্লাসরুমে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছি।

—এসেক্সের পাঠক

জীবনে কিছু ঘটাতে গেলে সেরা উপায় হলো, টিনেজার হিসেবে সঠিক পছন্দ বা নির্বাচন। the 7 Habits of Highly Effective Teenagers—এ কিশোর-কিশোরীরা তাদের জীবনের মূল শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে দেখতে পায়।

—স্টেডম্যান গ্রাহাম, You can make it happen গ্রন্থের লেখক